কাদিয়ানী সমস্যা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

কাদিয়ানী সমস্যা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৮৫

১ম সংস্করণ ১৯৯৩
৪র্থ প্রকাশ

জিলকাদ	১৪২৪
মাঘ	১৪১০
জানুয়ারী	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

قادیانی مسئلہ -এর বাংলা অনুবাদ

KADIANY SHAMASHA by Sayeed Abul A'la Moududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 15.00 Only.

পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর ১৯৫৩ সাল নাগাদ পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠে। এ সময় মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (র) জনগণ যেন আইনের সীমা লংঘন না করে এবং শিক্ষিত শ্রেণী যাতে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে এবং কাদিয়ানী সমস্যার যাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে সে উদ্দেশ্যে "কাদিয়ানী মাসআলা" নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। পুস্তিকাটি সকল মহলের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এদিকে পাঞ্জাবে কাদিয়ানী সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকার ও জনগণের মধ্যকার দাংগা ভয়াবহরূপ ধারণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ৫৩ সালের আটাশে মার্চ তারিখে মাওলানা মওদূদীসহ জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে কোন অভিযোগ ছাড়াই গ্রেফতার করে। এটা ছিল মূলত সামরিক কর্তৃপক্ষের ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতার নগ্ন বহিপ্রকাশ।

মাওলানাকে গ্রেফতারের পর তার বিরুদ্ধে "কাদিয়ানী মাসআলা" পুস্তিকার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এ অভিযোগেই ৮ই মে তারিখে সামরিক আদালত মাওলানাকে ফাঁসীর আদেশ প্রদান করে। মূলত এটা ছিল একটা ছুতা। ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালারকে যেনো তেনো উপায়ে হত্যা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর তীব্র বিরোধিতা ও ক্ষোভের মুখে তারা তাঁর মৃত্যু দণ্ডাদেশ মওকুফ করে তারা মাওলানাকে যাবজ্জীবনের কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করে। কিন্তু বিশ মাস কারাবাসের পর মাওলানা বিনা শর্তে মুক্তি লাভ করেন।

মজার ব্যাপার হলো, সামরিক কর্তৃপক্ষ যে "কাদিয়ানী মাসআলা" পুস্তিকা প্রণয়নের অজুহাতে মাওলানাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদান করে সে পুস্তিকাটির কিন্তু তারা বাজেয়াপ্ত করেনি। লাহোরের সামরিক আদালতে তার বিচার

চলাকালেই লাহোর শহরেই পুস্তিকাটি বাম্পার সেল চলছিল। মূলত পুস্তিকাটির কোথাও কোন উস্কানীমূলক কথা ছিল না। বরং তাতে তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিরোধিতা করেছেন। উল্লেখ্য, সে সময় জামায়াত বাদে অন্য সব দল একত্রিত হয়ে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট এ্যাকশন কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল। জামায়াতের কেন্দ্রিয় মজলিসে শুরার প্রস্তাবেও এরূপ কর্মসূচী ঘোষণার নিন্দা করা হয়।

কাদিয়ানীরা যে মুসলমান নয়, অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এ পুস্তিকায় তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কাদিয়ানীদেরকে আইনগত ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করাই ছিল মাওলানার দাবী। এ দাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য এ পুস্তিকায় সরবরাহ করা হয়েছে। এ দাবী আদায়ের লক্ষ্যে মাওলানা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলবার আহ্বান জানান। অবশেষে ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়। কাদিয়ানীরা যে, অমুসলিম এ ব্যাপারে উম্মতের গোটা আলেম সমাজ একমত।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে তৎকালীন পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ একত্রিত হয়ে শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশমালা বিবেচনা করে কতিপয় প্রস্তাবসহ সর্বসম্মতিক্রমে একটি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এতে মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে যারা নিজেদের ধর্মীয় নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদেরকে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণার দাবীও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রস্তাবে স্বাক্ষরদানকারী আলেমগণ হলেনঃ

১। মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ হাসান সাহেব
২। আল্লামা সোলায়মান নদবী সাহেব
৩। মাওলানা আবুল হাসানাত সাহেব
৪। মাওলানা দাউদ গজনবী সাহেব
৫। মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী সাহেব
৬। মাওলানা আহমদ আলী সাহেব
৭। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেব
৮। মাওলানা ইহতেশামুল হক সাহেব
৯। মাওলানা সামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব

১০। মাওলানা আবদুল হামেদ কাদেরী বদায়ূনী
১১। মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী সাহেব
১২। মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী সাহেব
১৩। মাওলানা খায়ের মোহাম্মদ সাহেব
১৪। হাজী মোহাম্মদ আমীন সাহেব
১৫। হাজী আবদুস সামাদ সরবাজী সাহেব
১৬। মাওলানা আতহার আলী সাহেব
১৭। মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ সাহেব
১৮। মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব
১৯। মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব
২০। মাওলানা মোহাম্মদ সাদেক সাহেব
২১। মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব
২২। খলিফা হাজী তুরুঙ্গজয়ী সাহেব- প্রমুখ

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের তৎপরতা ইদানিং বেশ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণার দাবীও বেশ জোরদার হচ্ছে। কিন্তু সরকার এখনো তাদের ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছেন। হয়তো বা কাদিয়ানীরা যে অমুসলিম নয়, সে ব্যাপারে কারো কারো মধ্যে সংশয় থাকতে পারে। এ সংশয় নিরসনকল্পে আমরা 'কাদিয়ানী মাসআলা'র বংগানুবাদ 'কাদিয়ানী সমস্যা' বইটি পুনঃ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম। মূল বইটি অনুবাদ হয়েছে ১৯৬৩ সালে সাধু ভাষায়। দীর্ঘদিন বইটি বাজারে ছিল না। সেই অনুবাদটির সাথেই আমরা এখন কাদিয়ানীদের প্রসংগে মাওলানার বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাসায়েল ও মাসায়েল' থেকে কতিপয় প্রশ্নোত্তর সংযোজন করে দিয়েছি। এতে পাঠকরা অধিকতর অবগতি লাভ করবেন বলে আশা করি।

এ বইটির সাথে আগ্রহী পাঠকগণকে অবশ্যি মাওলানার খতমে নবুয়্যাত পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করার অনুরোধ করছি। আর যে গ্রন্থটি এখনো উর্দূ ভাষা থেকে বংগানুবাদ হয়নি উর্দূ জানা ব্যক্তিগণকে মাওলানার সে গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গে পাঠ করার অনুরোধ করছি। গ্রন্থটির উর্দূ নাম হলো 'কাদিয়ানী মাসআলা আওর উসকে মাযহাবী, সিয়াসী আওর মাওয়াশিরাতি পাহলু'।

এ পুস্তিকাটির মাধ্যমে ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকারীদের সম্পর্কে মুসলমানগণ সতর্ক হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আমীন।

আবদুশ শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে করাচীতে একটি সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশসমূহ বিচার বিবেচনার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় ৩৩ জন আলেম একত্রিত হইয়া কতিপয় প্রস্তাবসহ একটি সংশোধনী রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নিজেদের ধর্মীয় নেতা হিসাবে অনুসরণকারীদিগকে আলাদা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে ঘোষণার দাবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাঞ্জাবী মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসন হইতে একটি আসন কাদিয়ানীদিগকে দেওয়ার জন্য উক্ত প্রস্তাবে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়াছিল তাহাও প্রণিধানযোগ্য।

ওলামা সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবসমূহের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন প্রকার দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ নাই। এই কারণেই আজ পর্যন্ত কেহ সে বিষয়ে প্রতিবাদ করা তো দুরের কথা টু শব্দটিও করেন নাই। আলেম বিদ্বেষীরাও এ বিষয়ে কোন প্রকার ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। যদি কেহ কোথাও কিছু বলিয়া থাকেন, তবে তাহা 'ব্যর্থ প্রেমিকের দীর্ঘ নিঃশ্বাস' ব্যতীত আর কিছুই নহে। শিক্ষিত সমাজে তাহার মূল্য নাই। কিন্তু সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে গৃহীত এই বিশেষ প্রস্তাবটি কাদিয়ানী সমস্যার সঠিক সমাধান হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ শিক্ষিত লোক এখনও ইহার প্রয়োজন এবং যৌক্তিকতা পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। পাঞ্জাব এবং বাহওয়ালপুর ব্যতীত দেশের অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ করিয়া পূর্ব অঞ্চলের জনসাধারণ এই সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই কারণেই দেশবাসীর সম্মুখে সর্বদলীয় সম্মেলনে কাদিয়ানী সম্প্রদায় সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবটির যৌক্তিকতা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক। এই পুস্তিকাটির মাধ্যমে আমি সেই চেষ্টাই করিব।

কাদিয়ানীদের আচরণ

কাদিয়ানীদিগকে মুসলমান হইতে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করার দাবী যে, তাহাদেরই স্বেচ্ছাক্রমে অনুসৃত কর্মপন্থার স্বাভাবিক পরিণতি, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

সাধারণ মুসলমানদের সহিত কাদিয়ানীদের যে বিরোধ তাহার প্রথম কারণ 'খতমে নবুওয়াত' সম্পর্কে নতুন ও বিপরীত ব্যাখ্যা প্রচার। দীর্ঘ সাড়ে তের শত বৎসর যাবৎ সমগ্র মুসলিম জাহান "খতমে নবুওয়াত" এর যে অর্থ এক বাক্যে স্বীকার করিতেছে তাহা এই যে, সাইয়েদুনা হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সা) আল্লাহ তায়ালার শেষ নবী এবং তাঁহার পরে আর কোন নবী প্রেরিত হইবে না।

খতমে নবুওয়তের নতুন ব্যাখ্যা

'খতমে নবুওয়ত' সম্পর্কে কোরআন শরীফে যে ঘোষণা রহিয়াছে এবং সাহাবায়ে কেরামগণ উক্ত ঘোষণার যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, উপরে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই মুসলমানদের ঈমান এবং বিশ্বাস। সুতরাং হুযুরে আকরামের (সা) পরে যে কোন ব্যক্তি নিজেকে নবী হিসাবে দাবী করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনায় সাহাবাগণ আদৌ ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু কাদিয়ানীরা ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই বিষয়ে এক অভিনব তফসীর আবিষ্কার করিয়া নতুন নবী আমদানীর পথ খোলাসা করিল। তাহারা "খাতিমুন্নাবিয়্যীন"-এর অর্থ করিল "নবীদের মোহর"-শেষ নবী নয়। সুতরাং হুযুরের (সা) পরে যে কোন নবী আসিবে (নাউযুবিল্লাহ) তাহার নবুওয়ত হযরতের নিকট সমর্থিত হইলেই সত্য বলিয়া গণ্য হইবে।

কাদিয়ানীদের এই দাবী সর্বজন বিদিত। এ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের পুস্তকাদি হইতে অসংখ্য প্রমাণ উপস্থিত করা চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে মাত্র তিনটি উধৃতি পেশ করিয়া ক্ষান্ত হইতে চাই।

"خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام
نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر

کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مُہر لگ جاتی
ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔
اسی طرح آنحضرتؐ کی مُہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح
نہیں ہے۔"

(ملفوظات احمدیہ مرتبہ محمد منظور الٰہی صاحب قادیانی،
حصہ پنجم ص ۲۹۰)

"খাতিমুন্নাবীয়্যীন" সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ) বলিয়াছেন যে, "খাতিমুন্নাবীয়্যীন" এর অর্থ তাহার মোহর ব্যতীত কাহারো নবুওয়াত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। যখন মোহর লাগিয়া যায় তখনই তাহা প্রামাণ্য হয় এবং সত্যরূপে স্বীকৃত বলিয়া বিবেচিত হয়। তদ্রূপ হযরতের মোহর এবং সত্য বলিয়া যে নবুওয়ত স্বীকৃতি লাভ করে নাই তাহা খাটি এবং সত্য নহে।" —মোহাম্মাদ মনজুর ইলাহী রচিত "মলফূজাতে আহমদিয়া" ৫ম খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা।

"ہمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین ہیں مگر ختم کے معنی وہ نہیں جو "احسان" کا سواد اعظم
سمجھتا ہے اور جو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اعلیٰ و
ارفع کے سراسر خلاف ہے کہ آپ نے نبوت کی نعمتِ عظمیٰ سے
اپنی امت کو محروم کر دیا۔ بلکہ یہ ہیں کہ آپ نبیوں کی مُہر ہیں۔
اب وہی نبی ہوگا جس کی آپؐ تصدیق کریں گے ...... انہی
معنوں میں ہم رسولِ کریمؐ کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔"

(الفضل، قادیان، مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۳۹ء)

"আমরা ইহা অস্বীকার করি না যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খাতিমুন্নাবীয়্যীন। কিন্তু 'খতম' এর যে অর্থ ইহসানের অধিকাংশ লোক

গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মহান মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাহা এই যে, তিনি নবুওয়তের ন্যায় বিরাট নেয়ামত হইতে নিজ উম্মতকে মাহরূম করিয়া গিয়াছেন, ইহা ঠিক নহে। বরং ইহার অর্থ এই যে, তিনি নবীদের মোহর ছিলেন। এখন তিনি যাহাকে নবী রূপে স্বীকার করিবেন সে-ই নবী হিসাবে গণ্য হইবে।— আমরা এই অর্থে তাহাকে খাতিমুন্নাবীয়্যীন বলিয়া বিশ্বাস করি।" —আলফজল পত্রিকা, কাদিয়ান, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯।

"خاتم مُہر کو کہتے ہیں۔ جب نبی کریم مُہر ہوئے تو اگر ان کی اُمت میں کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مُہر کس طرح ہوئے یا مُہر کس پر لگے گی؟"

(الفضل قادیان، مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۲۲ء)

'খাতিম মোহরকে বলা হয়। নবী করীম (সা) যখন মোহর তখন তাহার উম্মতের মধ্যে যদি নবী মোটেই না হয়, তবে তিনি মোহর হইলেন কিরূপে অথবা তাহা কিসের উপরে লাগিবে? —আলফজল, কাদিয়ান, ২২ মে, ১৯২২।

হাজার হাজার নবী

কোরআন শরীফের তাফসীর বা ব্যাখ্যা ঘটিত এই বিরোধ শুধু একটি শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। বরং কাদিয়ানীরা আরও অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিল -শুধু একজন নয় হাজার হাজার নবী আসিতে পারে এ কথা তাহাদের বিভিন্ন বিবৃতি এবং ঘোষণার মাধ্যমে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কতিপয় উধৃতি দেওয়া হইল।

"یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔"

(حقیقۃ النبوۃ مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان، ص ۲۲۸)

"একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হযরতের (সা) পরেও নবুওয়তের দরজা খোলা রহিয়াছে।"

—মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ প্রণীত হাকিকতুন্নবুওয়ত, ২২৮ পৃষ্ঠা।

"انہوں نے (یعنی مسلمانوں نے) یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا
کے خزانے ختم ہو گئے ——— ان کا یہ سمجھنا خدا
تعالیٰ کی ——— قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ
ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔"
(انوارِ خلافت، مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب - ص ۶۲)

"তাহারা অর্থাৎ মুসলামনেরা মনে করিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার ভান্ডার শেষ হইয়া গিয়াছে।–তাহাদের এই কথার মূলে আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা উপলব্ধি না করাই একমাত্র কারণ। নতুবা মাত্র একজন নবী কেন— আমি বলিব হাজার হাজার নবী আসিবে।"

—মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, আনওয়ারে খেলাফত, ৬২পৃষ্ঠা।

"اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے
اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اُسے ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے
کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے
ہیں۔"
(انوارِ خلافت ص ۶۵)

"আমার ঘাড়ের দুই দিকে তরবারী রাখিয়া আমাকে যদি বলা হয় যে, হযরতের (সা) পরে কোন নবী আসিবে না —তুমি এ কথা বল। তখনও আমি বলিব যে, তুমি মিথ্যাবাদী, কায্যাব। হযরতের পরে নবী আসিতে পারে, নিশ্চয়ই আসিতে পারে।" —আনওয়ারে খেলাফত, ৬৫ পৃষ্ঠা।

নবুওয়তের দাবী

এইভাবে নবুওয়তের দরজা খুলিয়া স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদ নিজের নবুওয়ত সম্পর্কে ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কাদিয়ানীরা তাহাকে সত্য নবী হিসাবে গ্রহণ করিল। প্রমাণ হিসাবে কাদিয়ানীদের অসংখ্য উক্তি উল্লেখ করা যায়। পাঠকগণের অবগতির জন্য এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হইল।

"اور مسیح موعود (یعنی مرزا غلام احمد صاحب) نے بھی
اپنی کتابوں میں اپنے دعوائے رسالت و نبوت کو بڑی صراحت
کے ساتھ بیان کیا ہے جیسا کہ آپ لکھتے ہیں کہ "ہمارا دعویٰ ہے
کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔" (دیکھو بدر، ۵ مارچ ۱۹۰۸ء)
یا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ "میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں
اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا۔ اور جس حالت میں
خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیونکر اس سے انکار کر سکتا ہوں۔
میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک کہ اس دنیا سے گزر جاؤں۔"
(دیکھو خط حضرت مسیح موعود بطرف ایڈیٹر اخبار عام لاہور)
یہ خط حضرت مسیح موعود نے اپنی وفات سے صرف تین دن
پہلے یعنی ۲۳ مئی ۱۹۰۸ء کو لکھا اور آپ کے یوم وصال
۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو اخبار عام میں شائع ہوا۔" (کلمۃ الفصل مصنفہ
صاحبزادہ بشیر احمد صاحب قادیانی۔ مندرجہ ریویو آف
ریلیجنز نمبر ۳، جلد ۱۴، ص ۱۱۰)

"মসীহে মওউদ অর্থাৎ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী স্বরচিত পুস্তকসমূহে নিজের নবুওয়ত দাবীর সমর্থনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, 'আমি নবী এবং রসূল —এই আমার

দাবী।' ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ প্রকাশিত বদর পত্রিকা দ্রষ্টব্য। অথবা তিনি অন্যত্র যেরূপ লিখিয়াছেনঃ 'আমি খোদার হুকুম অনুসারে একজন নবী। সুতরাং এখন যদি আমি তাহা অস্বীকার করি, তবে আমার গোনাহ্ হইবে। খোদা যখন আমার নাম নবী রাখিয়াছেন —তখন আমি কিরূপে তাহা অস্বীকার করিতে পারি। দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি স্থিরনিশ্চিতভাবে এই দাবীর উপরই কায়েম থাকিব। (লাহোরের আখবারে আম পত্রিকার সম্পাদকের নিকট প্রেরিত মির্জা গোলাম আহমদের চিঠি দ্রষ্টব্য)। মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ২৩শে মে তারিখে হযরত মসীহ মওউদ এই পত্রখানা লিখিয়াছিলেন এবং তাহার মৃত্যু দিবসে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ২৬শে মে আখবারে আম পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয়।" —মির্জা বশীরউদ্দীন আহমদ, কালেমাতুল ফছল এবং রিভিউ অব রিলিজনস পত্রিকার ৩য় বর্ষ, ১৪সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

• پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس
کے معنی سے حضرت صاحب (یعنی مرزا غلام احمد صاحب) ہرگز
مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں "
(حقیقۃ النبوت، مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ
قادیان ص ۱۴۷)

"অতএব ইসলামী শরীয়তে নবীর যে অর্থ করা হয় তদনুসারে হযরত সাহেব অর্থাৎ মির্জা 'গোলাম আহমদ' কোন মতে মাজাযী নবী নহেন বরং প্রকৃত নবী।" —মির্জা বশীরউদ্দীন মাহ্মুদ আহমদ প্রণীত হাকিকতুন্নবুওয়ত পুস্তকের ১৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মুসলমানরা কাফের

নবুওয়ত দাবীর স্বাভাবিক পরিণতি এই যে, যদি কেহ নবীর উপরে ঈমান না আনে, তবে সে ব্যক্তি কাফের বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য। সুতরাং কাদিয়ানীরা তাহাই করিয়াছে। যে সমস্ত মুসলমান মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উপরে নবী হিসাবে ঈমান আনে নাই, তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে

বক্তৃতা এবং বিবৃতির মাধ্যমে কাফের বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রমাণ হিসাবে এখানে কতিপয় উধৃতি দেওয়া হইল।

"کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل
نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی
نہیں سنا، وہ کافر اور دائرۂ اسلام سے خارج ہیں۔" (آئینۂ صداقت
مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۂ قادیان ص ۳۵)

"যে সকল মুসলমান হযরত মসীহে মওউদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে নাই —এমন কি যাহারা হযরত মসীহে মওউদের নাম পর্যন্ত শুনে নাই তাহারাও কাফের, ইসলামের বাহিরে।"

—মির্জা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ প্রণীত আইনায়ে ছাদাকত পুস্তিকার ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں
مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے مگر
مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرۂ اسلام
سے خارج ہے۔"
(کلمۃ الفصل، مصنفہ صاحب زادہ بشیر احمد صاحب قادیانی،
مندرجہ ریویو آف ریلیجنز ص ۱۱۰)

"যে ব্যক্তি মূসাকে মানে অথচ ঈসাকে মানে না, অথবা ঈসাকে মানে কিন্তু মুহাম্মাদকে মানে না, কিংবা মুহাম্মাদকে মানে কিন্তু মসীহে মওউদকে মানে না —সে ব্যক্তি শুধু কাফের নয় বরং পাক্কা কাফের এবং ইসলামের সীমা বহির্ভূত।" —মির্জা বশীরউদ্দীন আহমদ প্রণীত কালেমাতুল ফছল হইতে উধৃত রিভিউ অব রিলিজনস পত্রিকার ১১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"ہم چونکہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور غیر احمدی آپ
کو نبی نہیں مانتے اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کہ کسی
نبی کا انکار بھی کفر ہے غیر احمدی کافر ہیں۔"
(بیان مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب باجلاس سب جج عدالت
گورداسپور، مندرجہ اخبار الفضل مورخہ ۲۶/۲۹ جون ۱۹۲۲ء)

"আমরা যেহেতু মির্জা সাহেবকে নবী হিসাবে স্বীকার করি এবং অ-কাদিয়ানীরা তাহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করে না —এই কারণেই কোরআনে করীমের শিক্ষা অনুযায়ী একজন নবীকেও অস্বীকার করা যদি কুফরী হয়, তবে যাহারা আহমদী নয় তাহারাও কাফের।"

—গুরুদাসপুর সাবজজের এজলাসে মির্জা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ প্রদত্ত বিবৃতিঃ ২৬-২৯শে জুন ১৯২২ প্রকাশিত আল ফজল পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

কাদিয়ানীদের খোদা, ইসলাম, কোরআন

সাধারণ মুসলমানদের সহিত কাদিয়ানীদের শুধু মির্জা গোলাম আহমদ-এর নবুওয়ত দাবীর ভিত্তিতেই নহে বরং তাহাদের স্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী সকল বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। কাদিয়ানীদের মুখপত্র আল ফজল পত্রিকায় ১৯১৭ সালের ২১ আগষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'তোলাবা কো নাছায়েহ' শীর্ষক খলিফা সাহেবের বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত বক্তৃতায় তিনি কাদিয়ানী ছাত্রদের নিকট আহমদীদের সহিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের পার্থক্য কতখানি —তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বক্তৃতায় তিনি বলেনঃ

"ورنہ حضرت مسیح موعود نے تو فرمایا ہے کہ اُن کا (یعنی
مسلمانوں کا) اسلام اور ہے اور ہمارا اور، اُن کا خدا اور ہے
اور ہمارا اور، ہمارا حج اور ہے اُن کا حج اور، اسی طرح اُن سے
ہر بات میں اختلاف ہے۔"

"নতুবা হযরত মসীহে মওউদ তো এই কথাও বলিয়াছেন যে, তাহাদের অর্থাৎ মুসলমানদের ইসলাম আলাদা, আমাদের ইসলাম আলাদা, তাহাদের খোদা আলাদা, আমাদের খোদা আলাদা, আমাদের হজ্ব আলাদা, তাহাদের হজ্ব আলাদা, এই ভাবে তাহাদের সহিত প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদের বিরোধ রহিয়াছে।"

আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৯৩১ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে আলফজল পত্রিকায় খলিফা সাহেবের অন্য একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জীবদ্দশায় কাদিয়ানীদের জন্য আলাদা একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছিল তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। তখন এই প্রশ্ন লইয়া কাদিয়ানীদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল। একদল কাদিয়ানীর মতে আলাদা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাহারা বলিত যে, "আমাদের সহিত সাধারণ মুসলমানদের পার্থক্য মাত্র কয়েকটি বিষয়ে, কিন্তু হযরত মসীহে মওউদ আলাইহেস সালাম তাহার সমাধান করিয়াছেন। তিনি সে সকল বিষয়ে প্রমাণাদি বলিয়া দিয়াছেন। অন্য সব বিষয়ে সাধারণ মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষা লাভ করা যায়!" একটি দল এ মতের বিরোধিতা করিতেছিল।

ইতিমধ্যে মির্জা গোলাম আহমদ সাহেব সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সব কথা শুনার পরে নিজের রায় দিলেন। উক্ত রায় সম্পর্কে খলিফা সাহেব নিম্নলিখিত ভাষায় মন্তব্য করিয়াছেনঃ

"یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف
صرف وفات مسیح یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا
اللہ تعالےٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ
ایک ایک چیز میں اُن سے ہمیں اختلاف ہے۔"

"এ কথা ভুল যে, অন্যান্যদের সহিত আমাদের বিরোধ শুধু ওফাতে মসীহ অথবা মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালার সত্তা, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, কোরআন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি মোটকথা তিনি বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের সহিত প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদের বিরোধ রহিয়াছে।"

মুসলমানদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ

এই ব্যাপক মতবিরোধের চূড়ান্ত পরিণতি কাদিয়ানীদের হাতেই বাস্তবরূপ গ্রহণ করিল। তাহারা মুসলমানদের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া একটি আলাদা উম্মত হিসাবে নিজেদের সমাজ সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিল। ইহার প্রমাণ হিসাবে কাদিয়ানীদের রচনাবলী যে সাক্ষ্য দেয় তাহা এইঃ

"حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی سے تاکید فرمائی
ہے کہ کسی احمدی کو غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔
باہر سے لوگ اس کے متعلق بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم
جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ ہی میں یہی جواب دوں گا کہ
غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔"
(انوار خلافت، مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ
قادیان۔ ص ۸۹)

"হযরত মসীহে মওউদ (আ) অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করিয়াছেন যেন কোন আহমদী অন্যের পিছনে নামায না পড়ে। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক বার বার এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে। আমি বলিতেছি, তোমরা যতবার জিজ্ঞাসা করিবে ততবার আমি এই উত্তর দিব যে, অ-কাদিয়ানীদের পিছনে নামায পড়া জায়েয নাই, জায়েয নাই, জায়েয নাই।"

—মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফায়ে কাদিয়ানী রচিত আনওয়ারে খেলাফত–৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور
ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالےٰ
کے ایک نبی کے منکر ہیں۔"

(انوارِ خلافت۔ ص ۹۰)

"অ-কাদিয়ানীগণকে মুসলমান মনে না করাই আমাদের উচিত। তাহাদের পিছনে নামায পড়াও আমাদের উচিত নহে। কারণ তাহারা খোদাতায়ালার একজন নবীকে অস্বীকার করে।" —আনওয়ারে খেলাফত, ৯০ পৃষ্ঠা।

মুসলমান শিশুরাও কাফের

"اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ
کیوں نہ پڑھا جائے، وہ تو مسیح موعود کا منکر نہیں؟ میں یہ سوال
کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر
ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟
——— غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہوا، اس لیے اس
کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے (انوارِ خلافت۔ ص ۹۳)

"যদি অ-কাদিয়ানীর কোন ছোট শিশু-সন্তান মারা যায় তবে তাহার জানাযার নামায কেন পড়া হইবে না? কারণ শিশুটি তো আর মসীহে মওউদকে অস্বীকার করে না। আমি এই প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, যদি এই কথা সত্যই হইবে —তবে হিন্দু এবং খৃষ্টান শিশুদের জানাযা পড়া হয় না কেন? অ-কাদিয়ানীদের সন্তানও অ-কাদিয়ানীই সাব্যস্ত হইবে। এই কারণেই তাহাদের জানাযা পড়া উচিত নহে।" —আনওয়ারে খেলাফত, ৯৩ পৃষ্ঠা।

মুসলমানদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন

حضرت مسیح موعود نے اُس احمدی پر سخت ناراضگی کا
اظہار کیا ہے جو اپنی لڑکی غیر احمدی کو دے۔ آپ سے ایک
شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا لیکن آپ
نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں
میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی
دے دی تو حضرت خلیفہ اوّل نے اس کو احمدیوں کی امامت
سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھ
سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی باوجودیکہ وہ بار بار توبہ کرتا
رہا۔" (انوار خلافت۔ ص ۹۳-۹۴)

"যে কোন আহমদী নিজের কন্যা অ-কাদিয়ানীর সাথে বিবাহ দিবে তাহার সম্পর্কে হযরত মসীহে মওউদ অত্যন্ত রুষ্টভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এক ব্যক্তি তাহার কাছে বার বার এ কথা জিজ্ঞাসা করিল এবং নানাপ্রকার অসুবিধার কথা জানাইল। কিন্তু তিনি সেই লোকটিকে বলিলেন যে, মেয়েকে বসাইয়া (অবিবাহিত) রাখ; তথাপি অ-কাদিয়ানীর কাছে বিবাহ দিও না। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মৃত্যুর পরে সেই লোকটি নিজের মেয়েকে অ-কাদিয়ানীর কাছে বিবাহ দিলে প্রথম খলিফা তাহাকে ইমামের পদ হইতে অপসারণ করেন, তাহাকে জামাত হইতে খারিজ করিয়া দেন; এবং তাহার খেলাফতের ৬ বৎসর কালের মধ্যে লোকটির তওবা পর্যন্ত কবুল করেন নাই; যদিও লোকটি বার বার তওবা করিতেছিল।" —আনওয়ারে খেলাফত, ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা।

কাদিয়ানীদের মতে মুসলমান ও খৃষ্টান এক

حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی
سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر

احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا
حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی
کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں؟ دو قسم کے
تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی، دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا
سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے۔ اور دنیوی تعلق کا
بھاری ذریعہ رشتہ و ناطہ ہے۔ سو یہ دونوں ہمارے لیے
حرام قرار دیے گئے۔ اگر کہو کہ ہم کو اُن کی لڑکیاں لینے کی اجازت
ہے، تو میں کہتا ہوں نصاریٰ کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔
اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا
جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی
کریم نے یہود تک کو سلام کا جواب دیا ہے۔"
(کلمۃ الفصل۔ مندرجہ ریویو آف ریلیجنز صفحہ ۱۶۹)

"নবী করীম (সা) খৃষ্টানদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, হযরত মসীহে মওউদ অ-কাদিয়ানীদের সহিত ঠিক সেই নীতি অনুযায়ী ব্যবহার করিতেন। অ-কাদিয়ানীদের সহিত আমাদের নামায আলাদা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে আমাদের কন্যা দান হারাম করা হইয়াছে। তাহাদের জানাযা পড়িতে বারণ করা হইয়াছে। এখন আর বাকীই বা রহিল কি? যে বিষয়ে আমরা তাহাদের সহিত একত্র থাকিতে পারিব? পারস্পরিক যোগাযোগ দুই প্রকারের। একটি ধর্মীয় আর অপরটি পার্থিব। ধর্মীয় যোগাযোগ স্থাপনের মূলসূত্র হইল এবাদতের ঐক্য। আর পার্থিব সম্পর্কের বুনিয়াদ হইল আত্মীয়তা স্থাপন। কিন্তু এই উভয় প্রকারের সম্পর্ক আমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে। তোমরা যদি বল যে, তাহাদের কন্যা গ্রহণের অনুমতি তোমাদিগকে দেওয়া হইল কেন? তাহার উত্তর হইল এই যে, হাদিস দ্বারা একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অনেক সময় নবী করীম (সা) ইহুদীগণকেও সালামের জওয়াব দিয়াছেন।" —কালেমাতুল ফসল, রিভিউ অব রিলিজন্‌স, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

আমাদের দায়িত্ব

মুসলমানদের সহিত কাদিয়ানীদের এই সম্পর্কচ্ছেদ কেবল বক্তৃতা, বিবৃতি এবং রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বরং পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ নাগরিক ইহার সাক্ষ্য দিবেন যে, কাদিয়ানীরা কার্যত মুসলমানদের সংগে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ আলাদা একটি উম্মতে পরিণত হইয়াছে। তাহারা মুসলমানদের সহিত নামায পড়ে না, বিবাহ শাদীর ব্যাপারেও মুসলমানদের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই— মুসলমানদের জানাযার নামাযও পড়ে না। প্রকৃত অবস্থা যখন এই, তখন আর এমন কোন্ যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে পারে; যে জন্য মুসলমানদিগকে তাহাদের সহিত একই উম্মতের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা সম্ভব। বিভেদ-পার্থক্যের যে মতবাদ প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী হইয়াছে এবং গত ৫০ বৎসর যাবত এই বিরোধ বর্তমান, তখন আর আইনসংগত উপায়ে তাহা স্বীকার করা হইবে না কেন?

প্রকৃতপক্ষে কাদিয়ানী আন্দোলন 'খতমে নবুওয়ত'-এর তাৎপর্য সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দিয়াছে। পূর্বে শুধু মতবাদ হিসাবে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা বিশেষ আয়াসসাধ্য ছিল। পূর্বে যে কেহ এই প্রশ্ন করিতে পারিত যে, হযরত মুহাম্মাদের (সা) পরে নবীদের আগমন চিরতরে কেন বন্ধ করা হইয়াছে? কিন্তু কাদিয়ানীদের কার্যকলাপ দ্বারা, স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মুসলিম জাতির ঐক্য এবং সংহতির উদ্দেশ্যে মাত্র একজন নবীর আনুগত্যের ভিত্তিতে সমগ্র তাওহীদবাদীকে একসূত্রে সংঘবদ্ধ করার মূলে আল্লাহ তায়ালার কত বড় রহমত ও মেহেরবানী নিহিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিত্য নূতন নবুওয়তের দাবীর ফলে জাতির অস্তিত্ব কিরূপে বিপন্ন হয়— তাহাও পরিষ্কাররূপে বুঝা গেল। কারণ নিত্য নূতন নবুওয়তের দাবী জাতিকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে, উহার বিভিন্ন অংশকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়। বর্তমানে আমাদের এই অভিজ্ঞতা যদি কোন কাজে লাগে —ইহা দ্বারা আমাদের জ্ঞানচক্ষু যদি খুলিয়া যায় এবং আমাদের যদি এই নূতন উম্মতকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মুসলমান সমাজ হইতে ভিন্ন করিয়া ফেলি তবেই আর কোন দিন কেহ নবুওয়তের নূতন দাবীদার সাজিয়া মুসলমান সমাজে বিভেদ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সাহস পাইবে না। আমরা যদি একবার এই ধরনের অপচেষ্টার প্রশ্রয় দি-ই কিংবা সহ্য করি, তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, আমরা

এই ধরনের কার্যকলাপে উৎসাহ দান করিতেছি। আমাদের এই সহিষ্ণুতা ভবিষ্যতে একটি উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং জাতীয় জীবনে বিচ্ছেদ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা মাত্র একটি ঘটনায় সীমাবদ্ধ থাকিবে না। বরং আমাদের সমাজ নিত্য নূতন বিভেদ বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হইবে এবং বিভেদ সৃষ্টির আশংকা কোন দিনই বিদূরিত হইবে না।

কুটতর্কের অবতারণা

এই সমস্ত মৌলিক যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা কাদিয়ানীদিগকে মুসলমান জাতি হইতে আইনত আলাদা করিয়া একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে সরকারী ঘোষণার দাবী জানাইয়াছি। এই সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তির কোন সন্তোষজনক উত্তর কাহারও কাছে নাই। কিন্তু সরাসরি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া অপ্রাসঙ্গিক কতগুলি প্রশ্ন তোলা হইতেছে, যাহাতে জনসাধারণের দৃষ্টি মূল বিষয় হইতে সরিয়া অন্যত্র নিবদ্ধ হইতে পারে। যেমন বলা হয়, মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব হইতে এমন কতকগুলি দল রহিয়াছে যাহারা একে অপরকে কাফের বলিয়া প্রচার করে। এখনও তাহা দেখা যায়। এই কারণেই যদি কোন দলকে মুসলিম জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় তবে শেষ পর্যন্ত মূল জাতিরই কোন অস্তিত্ব থাকিবে না।

এই কথাও বলা হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে কাদিয়ানী সম্প্রদায় ব্যতীত আরো কতিপয় দল রহিয়াছে, যাহারা শুধু মৌলিক ব্যাপারেই অধিকাংশ মুসলমানদের সহিত বিরোধিতা করে না— বরং তাহারা সাধারণ মুসলমানদের সহিত আদৌ কোন সম্পর্ক না রাখিয়া, নিজেদের সমাজ সংস্থা গড়িয়া তুলিতেছে। তাহারাও তো কাদিয়ানীদের ন্যায় ধর্মীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। সুতরাং এখন তাহাদিগকেও কি উম্মত হইতে আলাদা করা হইবে? অথবা কোন্ বিশেষ কারণে কাদিয়ানীদের সম্পর্কে এই ব্যবস্থার দাবী করা হইয়াছে। কাদিয়ানীদের সেই বিশেষ অপরাধটি কি? যে কারণে অন্যান্য সকল সম্প্রদায়কে বাদ দিয়া কেবল মাত্র তাহাদিগকে মুসলিম জাতি হইতে আলাদা করার জন্য এতটা পীড়াপীড়ি করা হইতেছে।

ভ্রান্ত ধারণা

অনেকের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, "কাদিয়ানীরা আগাগোড়া খৃষ্টান, আর্য সমাজী এবং অন্যান্য আক্রমণকারীদের আঘাত হইতে ইসলামের হেফাযত করিয়া আসিতেছে। দুনিয়ার সর্বত্র তাহারা ইসলামের তাবলীগ করিতেছে? সুতরাং তাহাদিগকে কওম হইতে আলাদা করা কোন মতে শোভা পায় না।" শুধু তাহাই নহে, সম্প্রতি এ সম্পর্কে বিশেষ নির্ভরযোগ্য সূত্রে একথা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ মনে করেন, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক অবনতি ঘটিবে। কারণ, তাহাদের মতে ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় পররাষ্ট্র সচিবের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশী। সেখান হইতে কোন প্রকার সাহায্য পাইতে হইলে একমাত্র তাহার মারফতেই লাভ করা সম্ভব!

আমাদের জওয়াব

যেহেতু শেষোক্ত কথাটি বেশ একটু সংক্ষিপ্ত, এই কারণেই আমরা প্রথমে তাহার উত্তর দিব। অন্যান্য বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। একথা যদি সত্য হয় যে, রাষ্ট্রনায়কগণের ধারণা ইহাই তবে আমাদের বিবেচনা মতে এই ধরনের নির্বোধ এবং স্থবির লোকদের নাগপাশ হইতে দেশ যত শীঘ্র মুক্ত হয় ততই মঙ্গল। যাহারা গোটা জাতির ভবিষ্যৎ মাত্র একজন কিংবা গুটিকতক লোকের খেয়াল খুশীর উপরে নির্ভরশীল মনে করে, তাহাদের হাতে একটি মুহূর্তের জন্যও নেতৃত্ব ন্যস্ত করা যায় না। ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার কোন রাজনীতিবিদ এতটা মূর্খ নহেন যে, আট কোটি লোকের বসতিপূর্ণ একটি বিরাট দেশের অফুরন্ত উৎপাদন, সুযোগ-সুবিধা, ভৌগোলিক গুরুত্ব ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল মাত্র একজন লোকের উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করিবেন এবং এই দেশের সহিত যাবতীয় আদান—প্রদান মাত্র একটি লোকের জন্যই করিবেন। সুতরাং সেই লোকটি অপসারিত হইলেই তাহারা বাঁকিয়া বসিবেন এবং অভিযোগ তুলিবেন যে, "যাঁহার সম্মানার্থে আমরা তোমাদিগকে 'ভাত কাপড়' দিতেছি, তোমরা তাহাকেই সরাইয়া দিয়াছ।" ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার কোন রাজনীতিবিদ এতটা গণ্ডমূর্খ নহেন। বরং তাহারা যদি এই ধরনের মন্তব্য শুনিতে পান, তবে নিশ্চয়ই আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের বুদ্ধির বহর দেখিয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে হাঁসিয়া উঠিবেন। এবং তাহারা

বিস্মিত হইবেন যে, এই ধরনের 'শিশু ছাত্ররাই' কি হতভাগ্য দেশের হর্তাকর্তা সাজিয়াছে! যাহারা সামান্য এই কথাটি পর্যন্ত বুঝে না যে, বহির্বিশ্বে আমাদের কাদিয়ানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যতটুকু মান মর্যাদা দেখা যায় তাহার মূলে রহিয়াছে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব। এই বিশেষ পররাষ্ট্র সচিবটি ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তানের মর্যাদা এবং গুরুত্বের আদৌ কোন কারণ নহেন।

কুফুরী ফতোয়া

এখন আমরা পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর একটি একটি করিয়া বিস্তারিতভাবে পেশ করিব।

মুসলমান সমাজে নিসন্দেহে এই একটি ব্যাধির প্রকোপ রহিয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় একে অপরকে কাফের আখ্যা দিয়াছে। অনেকের মধ্যে এই কুৎসিৎ ব্যাধি এখনও দেখা যায়। কিন্তু ইহাকে প্রমাণ হিসাবে সামনে রাখিয়া কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে মুসলমান জাতির অন্তর্ভুক্ত রাখা একাধিক কারণেই সংগত নহে।

অসার যুক্তি

প্রথমত কুফুরী ফতোয়াদানের কতিপয় ভ্রান্ত এবং নিকৃষ্ট উদাহরণ উপস্থিত করিয়া এই নীতি গ্রহণ করা চলে না যে, কুফুরী ফতোয়া সকল সময়, সকল অবস্থায়ই ভ্রান্ত। কোন ব্যাপারে কাহারও বিরুদ্ধে আদৌ কুফুরী ফতোয়া দেওয়া উচিত নহে।

প্রকৃতপক্ষে ছোটখাট কারণে কাহাকেও কাফের বলা সঙ্গত নহে। তেমনি ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের প্রকাশ্য বিরোধিতার বেলায় কুফুরী ফতোয়ার প্রয়োগ না করাও মারাত্মক ভুল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাকথিত অসংগত কুফুরী ফতোয়া দ্বারা যদি কেহ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাহেন যে, সকল প্রকার কুফুরী ফতোয়া মূলত অন্যায়। তাহার কাছে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, প্রত্যেকটি লোক সকল অবস্থাতেই কি মুসলমান থাকিবে? সে যদি নিজকে খোদা বলিয়া দাবী করে, নিজকে নবী হিসাবে ঘোষণা করে কিংবা সে যদি ইসলামের বুনিয়াদী আকিদা বা মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী কার্যকলাপ প্রকাশ্যেই করিতে থাকে, তবে তাহাতে কি কিছুই আসে যায় না?

মিথ্যা অপবাদ

দ্বিতীয়ত এই স্থলে প্রমাণ হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত সম্প্রদায়ের কুফুরী ফতোয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের নেতৃস্থানীয় ওলামাগণ এই মাত্র সেই দিন করাচীতে সমবেত হইয়া শাসনতন্ত্রের মত গুরুতর বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করিলেন। এই কথা দেশের সকলেই জানেন। তাঁহারা সর্বসম্মতভাবে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা একে অপরকে মুসলমান মনে করেন বলিয়াই সমবেতভাবে এই কাজ সম্পাদন করিয়াছেন। মৌলিক বিরোধ সত্ত্বেও তাঁহারা একে অপরকে ইসলামের সীমা বহির্ভূত মনে করেন না এবং মুখেও এই কথা বলেন না, তাহার প্রমাণ হিসাবে এই ঘটনাটি যথেষ্ট নহে কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাদিয়ানীদিগকে মুসলমান সমাজ হইতে আলাদা করার পরে বিভিন্ন দল ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইবে বলিয়া যে আশংকা প্রকাশ করা হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন।

কাদিয়ানীদের স্বাতন্ত্র্য

তৃতীয়ত কাদিয়ানীদের কুফুরী সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। কাদিয়ানীরা একজন নূতন নবীর সমর্থন করিতেছে। ইহার ফলেই তাহারা আলাদা উম্মত হিসাবে গণ্য হইতে বাধ্য এবং তাহাদের এই নূতন নবীর প্রতি যাহারা ঈমান আনিবে না, তাহাদের সকলেই কাফের দলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই কারণেই সাধারণ মুসলমানদিগকে কাফের হিসাবে ঘোষণা করার ব্যাপারে কাদিয়ানীরা সম্পূর্ণ একমত।

সুতরাং এই ধরনের একটি মৌলিক বিরোধকে মুসলমানদের পারস্পরিক মামুলী মতভেদের পর্যায়ভুক্ত বলিয়া আদৌ সাব্যস্ত করা যায় না।

অন্যান্য সম্প্রদায়

কাদিয়ানী সম্প্রদায় ব্যতীত মুসলমান সমাজে আরও কতকগুলি দল রহিয়াছে, যাহারা ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়সমূহে মুসলমান সাধারণের বিরুদ্ধমত পোষণ করিতেছে। ধর্মীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তাহারা আলাদা সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু একাধিক কারণে কাদিয়ানীদের তুলনায় তাহাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত।

তাহারা সাধারণ মুসলমান সমাজ হইতে আলাদা হইয়া শুধু স্বতন্ত্র গোত্র হিসাবে অবস্থান করিতেছেন, সীমান্ত এলাকার পরিত্যক্ত ছোট ছোট জমি খণ্ডের সহিত তাহাদের তুলনা দেওয়া যায় এবং এই কারণেই তাহাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধৈর্য অবলম্বন করা সম্ভব। কিন্তু কাদিয়ানীরা মুসলমানের বেশভূষা ধারণ করিয়া মুসলমান সমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, ইসলামের নামেই তাহারা নিজেদের মতবাদ প্রচার করে। বিতর্ক এবং আক্রমণমূলক প্রচার কার্যে তাহারা অহর্নিশ ব্যস্ত সমস্ত। মুসলমানদের সমাজ সংস্থাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নিজেদের দল বৃদ্ধির চেষ্টায় তাহারা ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাহাদের অপচেষ্টার ফলে মুসলমান সমাজে নিতান্ত অনভিপ্রেত একটা স্থায়ী বিভেদ-বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে।

এই কারণেই অন্যান্যদের বেলায় আমরা যতটা ধৈর্য অবলম্বনে প্রস্তুত, কাদিয়ানীদের ক্ষেত্রে তাহা আদৌ সম্ভব নহে।

সামাজিক শৃংখলা বিনাশ

অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রশ্নটি শুধু দীনিয়াতশাস্ত্র সংক্রান্ত এবং তাহা এই যে, বিশেষ মতবাদ অনুসরণের জন্য তাহাদিগকে ইসলাম ভক্ত বা ইসলামের অনুকরণকারী বলিয়া বিবেচনা করা যায় কি না? তাহারা যদি ইসলামের অনুসরণকারী বলিয়া বিবেচিত নাও হয় তথাপি তাহারা বর্তমানে যেরূপ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে মুসলমানদের সহিত এইরূপ একত্র থাকিলেও ঈমানের ব্যাপারে কোন প্রকার আশংকা দেখা দিতে পারে না। তাহারা কোন প্রকার সামাজিক, অর্থনেতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু মুসলমান সমাজে কাদিয়ানী মতবাদের অবিশ্রান্ত প্রচার মুসলমানদের ঈমান বিশ্বাসের মূলে চরম আঘাত হানিবার উপক্রম করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যে কোন মুসলমান পরিবারে কাদিয়ানীদের প্রচার কিছুটা সফল হলে, সংগে সংগে সেখানেই সমাজ সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। তাই কোথাও বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, পিতা-পুত্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছে। আবার কোথাও বা সহোদর ভাইদের মধ্যে এমন পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, একজনের শোক-দুখেও অন্য ভাই শরীক হইতে পারে না। সর্বোপরি সরকারী অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাদিয়ানীরা সংঘবদ্ধ আক্রমণ

চালাইতেছে। ফলে সামাজিক সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য বহু সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র

কাদিয়ানী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়সমূহের রাজনৈতিক মতামত মুসলমান সমাজের জন্য কোন দিক দিয়াই এমন মারাত্মক নহে, যে জন্য অবিলম্বে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা বাধ্য হইব; কিংবা যাহাদের সম্পর্কে আমাদিগকে অষ্টপ্রহর সতর্ক সজাগ থাকিতে হইবে। এখন পর্যন্ত এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই।

কাদিয়ানীরা আগাগোড়া এই কথা ভালভাবেই জানে যে, নূতন নবুওয়তের দাবী করা কিংবা তাহার সমর্থন করার পরে স্বাধীনসার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন মুসলমান সমাজে টিকিয়া থাকা আদৌ সম্ভব নহে। তাহারা মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত জঘন্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং যে সমস্ত দাবীর ভিত্তিতে মুসলমান থাকা না থাকা নির্ভর করে, ইসলাম ও কুফুরীর মধ্যে যে সীমারেখা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া মুসলমানদের সমাজ সংস্থাকে নাস্তানাবুদ করিয়া দিতে পারে, সে সমস্ত বিষয়ে মুসলমান সমাজ অত্যন্ত সজাগ এবং সতর্ক। কাদিয়ানীরা মুসলমানদের ইতিহাস ভাল করিয়াই জানে এবং এই কথাও তাহাদের অজানা নহে যে, মুসলমান জাতি সাহাবায়ে কেরামের আমল হইতে এই পর্যন্ত এই ধরনের দাবীদারের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা এই কথা ভাল করিয়াই জানে যে, মুসলমানদের শাসনাধীন এলাকায় নিত্য নূতন 'নবুওয়তের প্রদীপ' কখনও জ্বলিতে দেওয়া হয় নাই। ভবিষ্যতেও যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে, এরূপ কোন আশংকা নাই। তাহারা এই কথাও বেশ ভাল করিয়াই জানে যে, শুধু অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক সরকারের প্রতি পূর্ণ অনুগত্য প্রকাশ করিয়া এবং সর্বপ্রকার সেবা সাহায্যের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করার পরেই ধর্মের আওতার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া খেয়ালখুশী অনুসারে কাজ করা সম্ভব। মুসলমান সমাজে যতখুশী ধর্মীয় বিরোধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হউক, তাহাতে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি বৃদ্ধির আশংকা নাই। এই কারণেই নবুওয়তের নূতন দাবীদাররা চিরদিন ইসলামী রাষ্ট্রের তুলনায় কুফুরী রাজত্বকে

উত্তম এবং গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছে। অথচ মুসলমান জাতিই তাহাদের চিরন্তন শিকার, কারণ তাহারা ইসলামের নামেই নিজেদের দাবী দাওয়া, আবেদন পেশ করে। কোরআন শরীফ এবং হাদীসকে তাহারা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু তাহারা নিজেদের স্বার্থের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে মুসলমানদিগকে কুফুরী রাষ্ট্রের পদানত রাখাই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। কারণ এইভাবে তাহারা মুসলমানদের অসহায় অবস্থার সুযোগে নিজেদের 'নবীলীলা' অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হয়। কুফুরী রাষ্ট্রের প্রতি পাকাপোক্ত, নির্ভেজাল এবং নিখুঁত আনুগত্যের বিনিময়ে মুসলমানদের ঈমান লইয়া ছিনিমিনি খেলার অবাধ সুযোগ লাভ করে। স্বাধীন–সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন দুর্গম প্রস্তরাকীর্ণ ক্ষেত্রের ন্যায় চাষাবাদের অযোগ্য। এই কারণেই তাহারা কোনদিন একান্তভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন জানায় নাই, আর তাহা পারেও না।

ইংরেজ সরকারের মেহেরবানী

এই কথার প্রমাণ হিসাবে মির্জা গোলাম আহমদ সাহেব এবং তাহার দলের পক্ষ হইতে প্রচারিত অসংখ্য বিবৃতির মধ্যে এখানে মাত্র কতিপয় উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

" بلکہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں کہ اگر
ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا مکہ میں گزارا ہو سکتا ہے
اور نہ قسطنطنیہ میں۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے
برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔"

(ملفوظات احمدیہ جلد اوّل۔ ص ۱۴۶)

"প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি এই সরকারের অনেক বেশী মেহেরবানী রহিয়াছে। কারণ, এখান হইতে আমরা যদি বাহিরে কোথাও যাই তবে আমাদের স্থান না মক্কায় জুটিবে না কনস্ট্যান্টিনোপলে। এমত অবস্থায় আমরা এই সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিরূপ ধারণা কিরূপে পোষণ করিব, এরূপ করা কিরূপে সম্ভব।" —মলফুজাতে আহমাদীয়া, ১ম খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

"میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ
مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ کابل میں مگر
اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں۔"
(تبلیغ رسالت، مرزا غلام احمد صاحب جلد ششم صفحہ ۶۹)

"আমি আমার কাজ না মক্কায় ভালভাবে চালাইতে পারি, না মদীনায়, না রোমে, না সিরিয়ায়, না ইরানে, না কাবুলে, কিন্তু এই সরকারের এলাকার মধ্যেই তাহা চলিতে পারে, যে সরকারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমি দোয়া করিতেছি।" —তাবলীগে রেসালাত মির্জা গোলাম আহমাদ, ৬ খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা।

"یہ تو سوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سایہ سے باہر
نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانا کہاں ہے۔ ایسی سلطنت کا بھلا
نام تو لو جو تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ ہر ایک اسلامی
سلطنت تمہیں قتل کرنے کے لیے دانت پیس رہی ہے۔
کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہو۔ سو تم اس
خداداد نعمت کی قدر کرو اور تم یقیناً سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ نے
سلطنت انگریزی تمہاری بھلائی کے لیے ہی اس ملک میں
قائم کی ہے اور اگر اس سلطنت پر کوئی آفت آئے تو وہ
آفت تمہیں بھی نابود کر دے گی ———— ۔ ذرا کسی اور
سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو کہ تم سے کیا سلوک کیا جاتا
ہے۔ سنو، انگریزی سلطنت تمہارے لیے ایک رحمت ہے،
تمہارے لیے ایک برکت ہے، اور خدا کی طرف سے تمہاری
وہ سپر ہے۔ پس تم دل و جان سے اس سپر کی قدر کرو۔ اور

ہمارے مخالف جو مسلمان ہیں ہزار ہا درجہ اُن سے انگریز بہتر ہیں کیونکہ وہ ہمیں واجب القتل نہیں سمجھتے۔ وہ تمہیں بے عزت نہیں کرنا چاہتے"۔ (اپنی جماعت کے لیے ضروری نصیحت از مرزا غلام احمد صاحب، مندرجہ تبلیغ رسالت جلد دہم۔ ص ۱۲۳)

"একটু ভাবিয়া দেখ তোমরা যদি এই সরকারের আশ্রয় হইতে বাহিরে চলিয়া যাও, তবে তোমাদের স্থান কোথায় হইতে পারে? এমন একটি রাষ্ট্রের নাম বল, যে তোমাদিগকে আশ্রয় দিবে। প্রত্যেকটি ইসলামী রাষ্ট্রই তোমাদের হত্যার জন্য দাঁত পিষিতেছে। কেননা তাহাদের মতে তোমরা কাফের এবং মোরতাদ সাব্যস্ত হইয়াছ। অতএব খোদা প্রদত্ত এই নেয়ামতের যত্ন কর এবং তোমরা নিশ্চিতরূপে এই কথা বুঝিয়া লও যে, খোদা তায়ালা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এদেশে ইংরেজদের রাজত্ব কায়েম করিয়াছেন। যদি এই সরকারের উপরে কোন প্রকার আপদ বিপদ দেখা দেয় তবে তাহা তোমাদিগকে ধ্বংস করিবে। ....তোমরা একটু অন্য কোন রাজ্যে যাইয়া কিছুদিন সেখানে বসবাস করিয়া দেখ যে, তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হয়? **শুন। ইংরেজদের রাজত্ব তোমাদের জন্য একটি বরকত** এবং খোদার তরফ হইতে তাহা তোমাদের জন্য **ঢাল স্বরূপ**। অতএব তোমরা নিজেদের জান প্রাণ দিয়া ঢালের যত্ন কর. হেফাজত কর, সম্মান কর। এবং আমাদের বিরোধী **মুসলমানদের তুলনায় তাহারা হাজারগুণে শ্রেষ্ঠ**। কারণ তাহারা আমাদিগকে واجب القتل 'ওয়াজেবুল কতল' বা হত্যার যোগ্য মনে করে না। তাহারা তোমাদিগকে অপদস্ত করিতে চাহে না।" —মির্জা গোলাম আহমদ সাহেব কর্তৃক নিজ জামাতের প্রতি জরুরী নসিহত–তবলীগে রেসালাত, ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা।

" ایرانی گورنمنٹ نے جو سلوک مرزا علی محمد باب بانی فرقہ بابیہ اور اس کے بیکس مریدوں کے ساتھ محض مذہبی اختلاف کی وجہ سے کیا اور جو ستم اس فرقے پر توڑے گئے وہ ان

دانش مند لوگوں پر مخفی نہیں ہیں جو قوموں کی تاریخ پڑھنے
کے عادی ہیں۔ اور پھر سلطنتِ ٹرکی نے جو ایک یورپ کی
سلطنت کہلاتی ہے جو برتاؤ بہاء اللہ بانی فرقہ بابیہ بہائیہ
اور اس کے جلا وطن شدہ پیرودوں سے ۱۸۶۳ء سے لے کر
۱۸۹۲ء تک پہلے قسطنطنیہ پھر ایڈریانوپل اور بعد ازاں
عکہ کے جیل خانے میں کیا وہ بھی دنیا کے اہم واقعات پر
اطلاع رکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا میں جن
ہی بڑی سلطنتیں کہلاتی ہیں[۱] اور تینوں نے جو تنگ دلی اور
تعصب کا نمونہ اس شائستگی کے زمانے میں دکھایا وہ احمدی
قوم کو یہ یقین دلائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ احمدیوں کی آزادی
تاجِ برطانیہ کے ساتھ وابستہ ہے ——— لہٰذا تمام
سچے احمدی جو حضرت مرزا صاحب کو مامور من اللہ اور ایک
مقدس انسان تصور کرتے ہیں بدون کسی خوشامد اور چاپلوسی
کے دل سے یقین کرتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ ان کے لیے
فضلِ ایزدی اور سایۂ رحمت ہے اور اس کی ہستی کو وہ اپنی
ہستی خیال کرتے ہیں۔"

(الفضل۔ ۱۳ ستمبر ۱۹۱۴ء)

"ইরান সরকার বাবিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা আলী মোহাম্মদ বাব এবং তাহার অসহায় মুরীদগণের সহিত ধর্মীয় মতবিরোধের কারণে যে ব্যবহার করিয়াছে এবং এই সম্প্রদায়ের উপরে যে অনাচার অত্যাচার করিয়াছে তাহা সেই সকল জ্ঞানী লোকদের নিকট অজানা নহে, যাহারা জাতিসমূহের

ইতিহাস পাঠে অভ্যস্ত। তা'ছাড়া তুর্কি রাজ্য —যাহা ইউরোপের একটি রাজ্য নামে পরিচিত —বাহাই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বাহাউল্লা এবং তাহার নির্বাসিত অনুগামীদের সহিত ১৮৬৩ সাল হইতে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত প্রথমে কুস্তুনতুনিয়ায় পরে আদ্রিয়ানোপলে এবং সর্বশেষে আক্কা জেলখানায় যে ব্যবহার করিয়াছে তাহা দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে যাহারা খোঁজ রাখেন তাহাদের নিকট অজানা নহে। দুনিয়ার বুকে তিনটি বড় রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত[১] তিনটি রাষ্ট্রই সংকীর্ণতা এবং বিদ্বেষভাবের যে নমুনা বর্তমান সভ্যতার যুগে প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা আহমদি জাতিকে নিশ্চিতরূপে এই কথা না বুঝাইয়া পারে নাই যে, আহমদিয়াদের স্বাধীনতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং যে সকল নিষ্ঠাবান আহমদি হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবকে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে প্রেরিত এবং একজন পবিত্র মহাপুরুষ হিসাবে মনে করে, বিনা তোষামদে এবং শঠতা ব্যতীত তাহারা বিশ্বাস করে যে, বৃটিশ সরকার তাহাদের জন্য খোদার রহমতের ছায়া। সুতরাং বৃটিশ সরকারের অস্তিত্বকে তাহারা নিজেদের সত্বা বলিয়া গণ্য করে, বিশ্বাস করে।" —আলফজল পত্রিকা, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৪।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি স্পষ্টভাষায় এই সাক্ষ্যই দিতেছে যে, কাফেরদের গোলামী মুসলমানদের জন্য যাহা চরম বিপদ, তাহাই নবুয়তের দাবীদার এবং তাহাদের ভক্ত অনুরক্তদের জন্য সঠিক রহমত ও খোদার মেহেরবানী বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ তাহারা এই আশ্রয়তলে থাকিয়া মুসলমানদের মধ্যে নিত্য-নূতন নবুয়তের আপদ এবং বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নিরংকুশ স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র মুসলমানদের নিকট যাহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত, আলোচ্য ব্যক্তিদের নিকট তাহাই আপদস্বরূপ। কেননা, সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন কোন মুসলমান সমাজ কোন অবস্থায় নিজ ধর্মের অনিষ্ট সাধন কিংবা সমাজ সংস্থাকে শতধাছিন্ন করার অপচেষ্টা সহ্য করিতে পারে না।

---

১. সম্ভবত তুরস্ক, ইরান এবং আফগানিস্তান এই তিনটি মুসলমান রাষ্ট্র।

কাদিয়ানী সরকার গঠনের আকাঙ্খা

বৃটিশের জুলুমশাহীকে খোদার রহমত এবং মুসলমানদের স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহকে আপদ মনে করিয়াই কাদিয়ানীরা ক্ষান্ত হয় নাই। বরং সম্প্রতি তাহাদের মধ্যে **পাকিস্তানের কোন এলাকায় একটি কাদিয়ানী রাষ্ট্রের ভিত্তি** স্থাপনের তীব্র আকাঙ্খা দেখা দিয়াছে।

প্রমাণস্বরূপ আমরা কাদিয়ানী খলিফার একটি বক্তৃতার কথা এখানে উল্লেখ করিতে চাই। আমাদের আলোচ্য এই বক্তৃতাটি পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর পূর্ণ একটি বৎসর অতিক্রম না করিতেই ১৯৪৮ সালের ২৩ শে জুলাই কোয়েটায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহা কাদিয়ানীদের মুখপত্র আলফজল পত্রিকার ১৩ই আগষ্ট সংখ্যায় নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

"برٹش بلوچستان ـــ جو اب پاکی بلوچستان ہے ـــ
کی کل آبادی پانچ یا چھ لاکھ ہے۔ یہ آبادی اگرچہ دوسرے صوبوں
کی آبادی سے کم ہے مگر بوجہ ایک یونٹ ہونے کے اسے بہت
بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں جیسے افراد کی قیمت ہوتی
ہے یونٹ کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کی کانسٹی
ٹیوشن ہے۔ وہاں اسٹیٹس سینٹ کے لیے اپنے ممبر منتخب کرتے
ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی اسٹیٹ کی آبادی دس کروڑ ہے
یا ایک کروڑ ہے۔ سب اسٹیٹس کی طرف سے برابر ممبر لیے
جاتے ہیں۔ غرض پاکی بلوچستان کی آبادی ۵-۶ لاکھ ہے اور اگر
ریاستی بلوچستان کو ملایا جائے تو اس کی آبادی ۱۱ لاکھ ہے۔ لیکن
چونکہ یہ ایک یونٹ ہے اس لیے اسے بہت بڑی اہمیت
حاصل ہے۔ زیادہ آبادی کو تو احمدی بنانا مشکل ہے۔ لیکن
تھوڑے آدمیوں کو احمدی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ پس جماعت

اس طرف اگر پوری توجہ دے تو اس صوبے کو بہت جلدی احمدی
بنایا جا سکتا ہے ـــــــ یاد رکھو تبلیغ اس وقت تک
کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہماری BASE مضبوط نہ ہو۔
پہلے BASE مضبوط ہو تو پھر تبلیغ پھیلتی ہے بس پہلے اپنی
BASE مضبوط کرو۔ کسی نہ کسی جگہ اپنی BASE بنا لو کسی ملک
میں ہی بنا لو ـــــــ اگر ہم سارے صوبے کو احمدی بنا
لیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایسا ہو جائے گا جس کو ہم اپنا صوبہ
کہہ سکیں گے اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔"

"বৃটিশ-বেলুচিস্তান এখন যাহা পাক-বেলুচিস্তান নামে পরিচিত, এখানের লোকসংখ্যা মাত্র পাঁচ লক্ষ। যদিও ইহার জনসংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক কম, তথাপি একটি ইউনিট হিসাবে ইহার গুরুত্ব অনেক। পৃথিবীতে যেরূপ মানুষের মর্যাদা, তেমনি মর্যাদা ইউনিটেরও। উদাহরণ হিসাবে মার্কিন শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে সিনেট সভার সদস্যগণ স্টেটের পক্ষ হইতে নির্বাচিত হয়। এই কথা আদৌ বিচার করা হয় না যে, স্টেটের জনসংখ্যা ১০ কোটি-না, এক কোটি। সকল স্টেটের পক্ষ হইতে সমান সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করা হয়। মোটকথা পাক-বেলুচিস্তানের জনসংখ্যা মাত্র ৫/৬ লক্ষ। এই সংগে যদি বেলুচিস্তানের দেশীয় রাজ্যগুলিও ধরা হয়, তবে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১১ লক্ষ। কিন্তু যেহেতু ইহা একটি ইউনিট, এই কারণে তাহার গুরুত্ব অনেক। জনসাধারণের অধিকাংশকে আহমদি মতে দীক্ষিত করা কঠিন; কিন্তু অল্পসংখ্যক লোককে আহমদিমতে দীক্ষত করা তেমন কঠিন নহে। সুতরাং জামাত যদি এই বিষয়ের প্রতি পূর্ণরূপে গুরুত্ব আরোপ করে, তবে এই প্রদেশটিকে অতি শীঘ্রই কাদিয়ানী বানানো সম্ভব হইবে। তোমরা একথা স্মরণ রাখিও যে, আমাদের ঘাটি বা ভিত্তিমূল BASE মজবুত না হওয়া পর্যন্ত তবলীগ সফল হইতে পারে না। প্রথমে যদি BASE ভিত্তিমূল বা ঘাটি মজবুত হয়, তবেই তবলীগ প্রসার লাভ করে।

এখন তোমরা নিজেদের ঘাঁটি নির্মাণ কর, যে কোন দেশে হউক না কেন। .....আমরা যদি গোটা প্রদেশটিকে আহমদি বানাইতে পারি, তাহা হইলে অন্তত একটি প্রদেশতো এমন হইবে যাহাকে আমরা নিজেদের প্রদেশ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিব। আর এই কাজ অতি সহজেই হইতে পারে।"

উপরে বর্ণিত উদ্ধৃতির কোন প্রকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অন্যান্য যে সকল সম্প্রদায়ের কথা উদাহরণ হিসাবে পেশ করিয়া কাদিয়ানীদিগকে বরদাশত করার জন্য মুসলমানগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়েরও কি অনুরূপ কোন অভিসন্ধি রহিয়াছে? তাহাদের মধ্যে এমন কোন সম্প্রদায় আছে কি যাহারা নিজেদের ধর্মমতের নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের উপরে অমুসলিমদের প্রাধান্যকে একান্ত কামনার ধন হিসাবে গণ্য করে? এবং মুসলমানদের প্রাধান্য লাভের সংগে সংগেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নিজেদের জন্য আলাদা একটি সরকার গঠনের জন্য তাহাদের কেহ ব্যস্তসমস্ত হইয়াছে কি? প্রকৃতই যদি সেরূপ কোন সম্প্রদায় না থাকে তবে কাদিয়ানীদের বেলায় তাহাদের উদাহরণ কেন দেওয়া হইতেছে?

পৃথকীকরণের যৌক্তিকতা

এখন তৃতীয় প্রশ্নটি আলোচনা করিতে চাই। অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যের দাবী সাধারণত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে করা হয়। কিন্তু কাদিয়ানীদের ব্যাপারে তাহার বিপরীত ভাবে সংখ্যাগুরু দল এই দাবী পেশ করিতেছে। ইহা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়।

প্রশ্নকারীদের মধ্যে একজন লোকও এমন নাই যিনি দুনিয়ার কোন রাজনৈতিক বাইবেল হইতে এমন একটি শ্লোক কিংবা আয়াত উধৃত করিয়া এই তথ্যটি সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, পৃথকীকরণের দাবী পেশ করা কেবল মাত্র সংখ্যালঘুদের পক্ষেই জায়েয, সংখ্যাগুরুদল এই ধরনের কোন দাবী পেশ করার অধিকারী নহে। অথবা এই নীতি কোনখানে লিপিবদ্ধ আছে এবং কে তাহা নির্ধারণ করিয়াছেন, আমাদিগকে অন্তত সে কথা জানান হউক।

প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের দাবী প্রয়োজনের ভিত্তিতেই করা হয় এবং যাহাদের প্রয়োজন তাহারাই দাবী পেশ করে। এখন দেখা দরকার যে, দাবীটি যে কারণে উপস্থিত হইয়াছে তাহা বিবেচনাপ্রসূত কিনা?

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে সামাজিক সমন্বয় সাধনের নীতি অনুসরণের ফলে যতখানি ক্ষতি হইতেছে, তাহা কেবল মাত্র সংখ্যাগুরুদের জন্যই সীমাবদ্ধ। অথচ কাদিয়ানীদের কোন ক্ষতির আশঙ্কাই নাই। এই কারণেই সংখ্যাগুরু দল বাধ্য হইয়া দাবী পেশ করিয়াছে যে, এই দলটিকে বিধিসম্মত উপায়ে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করা হউক। এক দিকে যাহারা কার্যত আলাদা থাকিয়া স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ সুযোগ সুবিধা উপভোগ করিতেছে অপর দিকে তাহারাই আবার সংখ্যাগুরুদের অংশ হিসাবে অবাধ যোগাযোগ সাধনের মাধ্যমে নিজেদের দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ পাইতেছে। এক দিকে তাহারা মুসলমানদের সহিত ধর্ম ও সামাজিক সংযোগ ছিন্ন করিয়া নিজেদের দল সংগঠন করিতেছে এবং সংঘবদ্ধ উপায়ে তাহারা মুসলমানদের অনিষ্ট সাধনের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা চালাইতেছে। অপর দিকে তাহারাই আবার মুসলমান সাজিয়া সংখ্যাগুরু দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া অজ্ঞ, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ এমন কি অল্প শিক্ষিতদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের দল ভারী করিতেছে। মুসলমান সমাজে বিভেদ বিশৃঙ্খলার আগুন লাগাইতেছে। সরকারী পদসমূহের বেলায়ও তাহারা মুসলমান সাজিয়া নিজেদের প্রাপ্য অংশের তুলনায় অনেক বেশী আত্মসাৎ করিতেছে। ইহার ফলে এখন কেবল মাত্র সংখ্যাগুরুদেরই ক্ষতি হইতেছে এবং সম্পূর্ণ গর্হিত উপায়ে এই বিশেষ দলটি নিজের পাল্লা ভারী করিতেছে। এমত অবস্থায় যদি সংখ্যালঘু দলটি আলাদা হইতে না চাহে তবে কোন্ যুক্তির বলে তাহাদিগকে সংখ্যাগুরুদের বুকের উপর জাঁতা ঘুরাইবার জন্য বসাইয়া রাখা হইবে এবং সংখ্যাগুরুদের পক্ষ হইতে উপস্থাপিত স্বাতন্ত্র্যের দাবী বাতিল করা হইবে?

মূলত এ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের কারণ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের আচরণ নহে; বরং এ জন্য কাদিয়ানীগণ নিজেরাই দায়ী। কারণ তাহারা নিজেদের জন্য আলাদা সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। সংখ্যাগুরুদের সহিত ধর্মীয়, সামাজিক যোগাযোগ নিজেরাই ছিন্ন করিয়াছে। নিজেদের অনুসৃত কর্মপন্থার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে স্বাতন্ত্র্যের দাবী স্বীকার করাই তাহাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু তাহারা যদি ইহাতে রাজী না হয়, কিংবা মূল প্রশ্নটি এড়াইয়া যাইতে চাহে, তবে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা কেন এড়াইতে চাহে? আল্লাহ তায়ালা যদি দেখার জন্য আপনাকে চক্ষু দান করিয়া থাকেন, তবে আপনি নিজেই

দেখুন যে, কেন তাহারা নিজেদের অনুসৃত কর্মপন্থার স্বাভাবিক পরিণতির সম্মুখীন হইতে রাজী নহে? তাহারা যদি ধোঁকা, প্রবঞ্চনার ভিত্তিতেই নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করিতে চাহে, তবে আপনাদের জ্ঞানবুদ্ধি কোথায় নির্বাসিত হইয়াছে যে, আপনারাই আজ তাহাদের প্রবঞ্চনার লক্ষ্য হিসাবেই থাকার জন্য নিজেদের কওমকে বাধ্য করিতেছেন?

কাদিয়ানীদের ইসলাম প্রচার

এখন সর্বশেষ যুক্তিটির উত্তর দেওয়া আবশ্যক। মূল যুক্তিটি ছিল এই যে, কাদিয়ানীরা ইসলামের হেফাজত এবং তাবলীগ করিতেছে। সুতরাং তাহাদের সহিত এরূপ আচরণ সংগত নহে।

যে ধারণার ভিত্তিতে এই যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, মূলত তাহা ভ্রান্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অনেকেই এই ভ্রান্তির কবলে পতিত হইয়াছেন। এই কারণেই আমরা তাহাদের কাছে একটি অনুরোধ জানাইব, তাহা এই যে, আপনারা একটু মনোযোগ দিয়া কাদিয়ানীদের নেতা মির্জা সাহেবের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি পাঠ করুন। ইহা দ্বারা আপনারা উক্ত ধর্ম প্রবর্তকটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সহজেই স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারিবেন।

১৯০২ সালের ২৮ শে অক্টোবর তারিখে কাদিয়ানীদের 'জিয়াউল ইসলাম' প্রেস হইতে মুদ্রিত 'তিরিয়াকুল কুলূব' গ্রন্থের ৩নং পরিশিষ্ট 'হুজুর গভর্ণমেন্ট আলিয়া মেঁ এক আজেযানা দরখাস্ত' –'মহান সরকার বাহাদুরের সমীপে একটি সবিনয় আবেদনে' মির্জা গোলাম আহমদ সাহেব বলেন–

"بیس برس کی مدّت سے میں اپنے دلی جوش سے ایسی
کتابیں زبان فارسی اور عربی اور اردو اور انگریزی میں شائع
کر رہا ہوں جن میں بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے
جس کے ترک سے وہ خدا تعالیٰ کے گناہ گار ہوں گے کہ اس
گورنمنٹ کے سچے خیر خواہ اور دلی جاں نثار ہو جائیں اور جہاد اور

خونی مہدی کے انتظار وغیرہ بیہودہ خیالات سے جو قرآن شریف
سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتے۔ دست بردار ہو جائیں اور اگر
وہ اس غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو کم سے کم یہ ان کا فرض ہے
کہ اس گورنمنٹ محسنہ کے ناشکرگزار نہ بنیں اور نمک حرامی
سے خدا کے گناہگار نہ ٹھیریں۔" (ص ۳۰۷)

"বিশ বৎসর কাল হইতে আমি আন্তরিক অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ আগ্রহের সহিত ফারসী, আরবী, উর্দু এবং ইংরেজী ভাষায় এমন সব বই পুস্তক প্রকাশ করিতেছি, যাহাতে বারবার এই কথা লিখা হইয়াছে যে, মুসলমানদের কর্তব্য, যাহা ত্যাগ করিলে তাহারা খোদার নিকট পাপী হইবে তাহা এই যে, তাহারা বর্তমান সরকারের প্রকৃত শুভাকাংখী এবং একান্তভাবে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। এ ছাড়া জিহাদ এবং খুনী মাহদির প্রতীক্ষা ইত্যাদি বেহুদা বাজে ধারণা যাহা কোরআন শরীফ দ্বারা কোনমতে প্রমাণিত হয় না, তাহা ত্যাগ করিবে। একান্তই যদি তাহারা এই ভ্রান্তমত বর্জন করিতে না চাহে তবে তাহাদের কর্তব্য, বর্তমান অনুগ্রহ পরায়ণ সরকারের অকৃতজ্ঞ না হওয়া এবং নিমকহারামী করিয়া যেন খোদার গোনাহগার না হয়।" (৩০৭ পৃঃ)।

পুনরায় তিনি উক্ত সবিনয় বিবেদনে লিখিয়াছেন,

"اب میں اپنی گورنمنٹ محسنہ کی خدمت میں جرأت
سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ بست سالہ میری خدمت ہے جس کی
نظیر برٹش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کر سکتا
یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قدر لمبے زمانہ تک جو بیس برس کا زمانہ ہے
ایک مسلسل طور پر تعلیم مذکورہ بالا پر زور دیتے جانا کسی منافق اور
خود غرض کا کام نہیں ہے بلکہ ایسے شخص کا کام ہے جس کے دل

میں اس گورنمنٹ کی سچی خیرخواہی ہے۔ ہاں میں اس بات کا اقرار
کرتا ہوں کہ میں نیک نیتی سے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے
مباحث بھی کیا کرتا ہوں اور ایسا ہی پادریوں کے مقابل پر بھی
مباحثات کی کتابیں شائع کرتا رہا ہوں اور میں اس بات کا بھی
اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پادریوں اور عیسائی مشنریوں کی
تحریر نہایت سخت ہو گئی اور حد اعتدال سے بڑھ گئی اور بالخصوص
پرچہ نور افشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت
گندی تحریریں شائع ہوئیں اور ان مؤلفین نے ہمارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ
شخص ڈاکو تھا، چور تھا، زنا کار تھا، اور صدہا پرچوں میں یہ شائع
کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدنیتی سے عاشق تھا اور با ایں ہمہ
جھوٹا تھا اور لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا تو مجھے ایسی کتابوں
اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا
مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات
کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو تب میں نے ان
جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی
مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لیے حکمت عملی یہی
ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے۔
تا سریع الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں
کوئی بدامنی پیدا نہ ہو۔ تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن
میں کمال سختی سے بدزبانی کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھیں جن

میں بالمقابل سختی تھی کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ
دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش رکھنے والے آدمی
موجود ہیں۔ ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق
کافی ہوگا۔" (ص ۳۰۸-۳۰۹)

"এখন আমি আমার প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ সরকার বাহাদুরের খেদমতে সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, ইহাই আমার দীর্ঘ বিশ বৎসরের খেদমত, সেবা। বৃটিশ ভারতের অন্য কোন মুসলমান পরিবার এমন উদাহরণ পেশ করিতে পারিবে না। আর এ কথাও বেশ স্পষ্ট যে, এত দীর্ঘকাল যাহা বিশ বছরের একটি যুগ ধরিয়া উপরোক্ত মতবাদ ও শিক্ষা প্রসারের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া কোন মোনাফেক কিংবা স্বার্থপরের পক্ষে সম্ভব নহে। বরং ইহা তেমন লোকের পক্ষেই সম্ভব যাহার অন্তরে বর্তমান সরকারের প্রতি প্রকৃত দরদ এবং হিতাকাংখা রহিয়াছে। হাঁ, আমি এই কথা অবশ্যই স্বীকার করিব যে, আমি নেক নিয়তের সহিত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিতর্ক করিয়া থাকি। তেমনি পাদ্রীদের বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক কেতাবাদি প্রকাশ করিয়া থাকি। আমি এই কথাও স্বীকার করি যে, পাদ্রী এবং খৃষ্টান মিশনারীদের কোন লেখা যখন অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছে এবং সীমা লংঘন করিয়াছে বিশেষ করিয়া লূধিয়ানা হইতে প্রকাশিত 'নূরআফসাঁ' নামক পত্রিকায় অত্যন্ত জঘন্য এবং কদর্য রচনা প্রকাশিত হয়, তাহাতে উক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আমাদের নবী (সা) সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা হযরত (সা) সম্পর্কে বলিয়াছে যে, এই ব্যক্তি চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী ছিল (নাউযুবিল্লাহ)। এছাড়া তাহাদের অসংখ্য পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছে যে, এই ব্যক্তি নিজ কন্যার প্রতি অসৎভাবে আসক্ত ছিল (নাউযুবিল্লাহ)। এতদ্ব্যতীত এই লোকটি মিথ্যাবাদী, দাঙ্গাবাজ এবং নরহন্তা ছিল। এই সমস্ত পুস্তক এবং পত্রিকাদি পাঠ করিয়া আশংকা হইল যে, মুসলমানদের প্রাণে— যাহারা একটি উত্তেজনাপূর্ণ জাতি– এই সমস্ত উক্তির ফলে তাহাদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং আমি তাহাদের উত্তেজনা হ্রাস করার জন্যই আমার বিবেচনা মতে সৎনিয়ত এবং সঠিক নিয়ম অনুসারে ইহাই সংগত মনে করিয়াছি যে,

এই সাধারণ উত্তেজনা দমন করার জন্য **কৌশলস্বরূপ** এই সমস্ত রচনার উত্তর কিছুটা কঠোর ভাষায় দেওয়া উচিত। যেন– আকস্মিক উত্তেজনা পরায়ণ লোকগুলির ক্রোধ দমন হয় এবং দেশে যাহাতে কোন প্রকার বিশৃংখলা দেখা না দেয়। সুতরাং আমি এমন সব পুস্তকের বিরুদ্ধে যাহাতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গালিগালাজ করা হইয়াছিল, এরূপ কয়েকখানা কেতাব লিখিয়াছি, যাহাতে অপেক্ষাকৃত কঠোরতা ছিল। কারণ আমার চেতনা নিশ্চিতরূপে আমাকে এই ফতোয়া দিয়াছিল যে, ইসলামে যে অসংখ্য পশুর ন্যায় উত্তেজনা বিশিষ্ট লোক রহিয়াছে, তাহাদের ক্রোধ, বিক্ষোভের আগুন নিবাইবার জন্যই এই পন্থা যথেষ্ট হইবে।" ৩০৮ ও ৩০৯ পৃষ্ঠা।

মাত্র কয়েক লাইন পরেই তিনি পুনরায় লিখিয়াছিলেন,

"سو مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے۔ کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا اور میں دعوی سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجے کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اوّل درجے پر بنا دیا ہے۔ (۱) اول والد مرحوم کے اثر نے (۲) دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے (۳) تیسرے خدا تعالی کے الہام نے۔" (ص ۳۰۹-۳۱۰)

"পাদ্রীদের মোকাবেলার জন্য আমা দ্বারা যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা এই যে কর্ম কৌশল দ্বারা পশু-শ্রেণীর মুসলমানদিগকে খুশী করা হইয়াছে এবং এই কথা আমি দাবীর সহিত বলিতে পারি যে, সমগ্র মুসলমান জাতির মধ্যে ইংরেজ সরকারের হিতাকাংখী হিসাবে আমার স্থান সকলের উপরে। কারণ তিনটি জিনিস আমাকে ইংরেজ সরকারের হিতাকাংখায় প্রথম পর্যায়ে পৌছাইয়াছে। প্রথম–মরহুম পিতার প্রভাব, দ্বিতীয়–বর্তমান সরকারের বিশেষ অনুগ্রহ, তৃতীয়–খোদার এলহাম।" ৩০৯ ও ৩১০ পৃঃ।

কাদিয়ানীদের আশ্রয়দাতা

সিয়ালকোটের পাঞ্জাব প্রেস হইতে মুদ্রিত শাহাদাতুল কোরানের ষষ্ঠ মুদ্রণে 'সরকারের লক্ষ্য করার যোগ্য' শীর্ষক একটি পরিশিষ্ট রহিয়াছে। তাহাতে মির্জা সাহেব লিখিয়াছেন,

"سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ
اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا تعالی کی اطاعت کریں۔
دوسرے اُس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں
کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سو وہ سلطنت حکومت
برطانیہ ہے۔" (ص ۳)

"অতএব আমার ধর্ম— যাহা আমি বরাবর প্রকাশ করি এই যে, ইসলামের দুইটি অংশ রহিয়াছে। প্রথমত আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য স্বীকার করা। দ্বিতীয়ত সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা যাহা শান্তি স্থাপন করিয়াছে, অত্যাচারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নিজের আশ্রয়ে আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহা হইতেছে **বৃটিশ সরকার**।" (৩য় পৃষ্ঠা)।

১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত তবলীগে রেসালাতের অষ্টম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট (ফারুক প্রেস, কাদিয়ান হইতে মুদ্রিত) 'ব-হুজুর নওয়াব লেফটেনেন্ট গভর্ণর বাহাদুর দামা ইকবালুহ'- 'লেফটেনেন্ট গভর্ণর বাহাদুরের সমীপে' শীর্ষক এক আবেদনে মির্জা সাহেব প্রথমে নিজ পূর্ব পুরুষদের আনুগত্য সম্পর্কে বিবরণ উল্লেখ করার পর প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় চিঠির নকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত চিঠিসমূহ তাঁহার পিতা মির্জা গোলাম মোরতজা খানকে লাহোরের কমিশনার, পাঞ্জাবের ফিনান্সিয়াল কমিশনার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ইংরেজ কর্মচারীগণ বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যমূলক অসংখ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাহার অন্যান্য উর্ধতন পুরুষগণ ইংরেজদের সেবায় যে সমস্ত কাজ করিয়াছিলেন তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন।

অতপর তিনি লিখিয়াছেন,

"میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ برس
کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول
ہوں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سچی محبت
اور خیرخواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض
کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں جو
ان کو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔" (ص ۱۰)

"আমি আমার প্রথম বয়স হইতে এ পর্যন্ত যখন আমি ৬০ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছি। আমার মুখ, আমার কলম দ্বারা আমি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজেই মশগুল রহিয়াছি— যেন, মুসলমানদের অন্তরকে ইংরেজ সরকারের খাঁটি ভালবাসা, হিতাকাংখা ও সহানুভূতির দিকে ফিরাইতে পারি। এবং তাহাদের এক শ্রেণীর অল্প বুদ্ধির লোকদের মন হইতে যেন জেহাদের গলৎ ধারণা ইত্যাদি দূর করিতে পারি। যাহা তাহাদের মনের বিকার দূরীভূত হওয়া এবং সৌহার্দ্য সম্পর্ক স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।" (১০পৃঃ)।

তিনি আরও লিখিতেছেন,

"اور میں نے نہ صرف اسی قدر کام کیا کہ برٹش انڈیا کے
مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سچی اطاعت کی طرف جھکایا بلکہ
بہت سی کتابیں عربی اور فارسی اور اردو میں تالیف کرکے ممالک
اسلامیہ کے لوگوں کو بھی مطلع کیا کہ ہم لوگ کیونکر امن اور آرام اور
آزادی سے گورنمنٹ انگلشیہ کے سایۂ عاطفت میں زندگی بسر کر
رہے ہیں۔" (ص ۱۰)

"আর আমি শুধু এই কাজই করি নাই যে, বৃটিশ ভারতের মুসলমানদিগকে বৃটিশ সরকারের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্যের দিকে ঝুকাইয়াছি। বরং আরবী, ফারসী এবং উর্দুতে কেতাব লিখিয়া ইসলামী রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীদিগকেও

জানাইয়াছি যে, আমরা বৃটিশ সরকারের আশ্রয়তলে থাকিয়া কিরূপে সুখে-শান্তিতে এবং স্বাধীনভাবে জীবন কাটাইতেছি! (১০পৃঃ)।

অতপর তিনি স্বরচিত পুস্তকাদির একটি দীর্ঘ তালিকা তাহাতে পেশ করিয়াছেন। তাহার মতে উক্ত তালিকাভুক্ত পুস্তকাদির সাহায্যে ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যমূলক যেসকল কাজ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

এ সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন,

"گورنمنٹ تحقیق کرے کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہزاروں مسلمانوں
نے جو مجھے کافر قرار دیا اور مجھے اور میری جماعت کو جو ایک گروہِ
کثیر پنجاب اور ہندوستان میں موجود ہے ہر ایک طور کی بد گوئی
اور بد اندیشی سے ایذا دینا اپنا فرض سمجھا اس تکفیر اور ایذا کا ایک
مخفی سبب یہ ہے کہ ان نادان مسلمانوں کے پوشیدہ خیالات کے
برخلاف دل و جان سے گورنمنٹ انگلشیہ کی شکر گزاری کے لیے
ہزارہا اشتہارات شائع کیے گئے اور ایسی کتابیں بلادِ عرب و
شام وغیرہ تک پہنچائی گئیں ۔ یہ باتیں بے ثبوت نہیں ۔ اگر
گورنمنٹ توجہ فرماوے تو نہایت بدیہی ثبوت میرے پاس
ہیں ۔ میں زور سے کہتا ہوں اور میں دعویٰ سے گورنمنٹ کی
خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ باعتبار مذہبی اصول کے مسلمانوں
کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اوّل درجے کا وفادار اور
جان نثار یہی نیا فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول
گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں ۔" (ص ۱۳)

"সরকার বাহাদুরের উচিত অনুসন্ধান করিয়া দেখা যে, ইহা সত্য কিনা হাজার হাজার মুসলমান, যাহারা আমাকে কাফের বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে

এবং আমার জামায়াতকে, যাহাতে পাঞ্জাব এবং ভারতের অসংখ্য লোক শামিল রহিয়াছে— সকল গালিগালাজ এবং অনিষ্টসাধন করাই নিজেদের কর্তব্য মনে করিল। আমার এই কুফরী এবং অনিষ্ট সাধনের মূলে একটি গোপন কারণ রহিয়াছে। তাহা এই যে, সেইসব নাদান মুসলমানদের গোপন মতবাদের বিরুদ্ধে সর্বান্তকরণে ইংরেজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার প্রচারপত্র বিতরণ করা হইয়াছে এবং এই ধরনের কেতাবসমূহ আরব দেশ এবং সিরিয়া পর্যন্ত পৌছান হইয়াছে। এই সব কথা প্রমাণহীন নহে। সরকার বাহাদুর যদি একটু লক্ষ্য করেন, তবে আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আমি জোরগলায় বলিতেছি এবং আমি দাবীর সহিত সরকার বাহাদুরের খেদমতে এই ঘোষণা করিতেছি যে, ধর্মীয়নীতি হিসাবে মুসলমানদের সকল সম্প্রদায়ের তুলনায় সরকারের প্রথম শ্রেণীর অনুগত, আত্মোৎসর্গকারী এবং হিতাকাংখী একমাত্র এই নূতন সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের কোন নীতিই সরকারের পক্ষে ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক নহে।" (১৩ পৃষ্ঠা)।

পুনরায় তিনি আরও লিখিয়াছেন,

"اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں
گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے۔کیونکہ
مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔"

(ص ١٧)

"এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, আমার মুরীদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে জেহাদের বিধান সমর্থনকারীদের সংখ্যা ততই হ্রাস পাইবে। কারণ আমাকে মসীহ এবং মাহদী হিসাবে মানিয়া লওয়াই জেহাদের বিধানকে অস্বীকার করা।" (১৭ পৃষ্ঠা)।

তাবলীগ রহস্য

উপরে যে সমস্ত উধৃতি পেশ করা হইল, তাহার ভাষা এবং রচনা পদ্ধতি কোন নবীর কিনা আপাতত এই প্রশ্নটি বাদ দিন। এই স্থলে আমরা যে

বিষয়টির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই তাহা এই যে, এই ধর্মের তাবলীগ দীক্ষা এবং ইসলাম রক্ষার উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে স্বয়ং ধর্ম প্রতিষ্ঠাতা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, এই বর্ণনার পরেও তাহার 'দীনের খেদমত' কোন প্রকার সমর্থন লাভের যোগ্য কিনা? এতসব কাণ্ড কারখানার পরেও যদি কেহ এই ধরনের 'দীনের খেদমত'-এর তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হয়, তবে আমরা তাহাকে সবিনয় নিবেদন জানাইব যে, একবার কাদিয়ানীদের স্বীকারোক্তিসমূহ নিজের চক্ষু মেলিয়া পাঠ করুনঃ

"عرصۂ دراز کے بعد اتفاقاً ایک لائبریری میں ایک کتاب
ملی جو چھپ کر نایاب بھی ہو گئی تھی۔ اس کتاب کا مصنف ہے
ایک اطالوی انجینئر جو افغانستان میں ذمہ دار عہدہ پر فائز تھا۔ وہ
لکھتا ہے کہ صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب (قادیانی) کو اس لیے
شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور حکومتِ افغانستان
کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس سے افغانوں کا جذبۂ حریت کمزور ہو
جائے گا اور ان پر انگریزوں کا اقتدار چھا جائے گا ـــــ ایسے معتبر راوی
کی روایت سے یہ امر پایۂ ثبوت تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر صاحبزادہ
عبد اللطیف صاحب شہید خاموشی سے بیٹھے رہتے اور جہاد کے
خلاف کوئی لفظ بھی نہ کہتے تو حکومت افغانستان کو انہیں شہید کرنے
کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔" (مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا
خطبۂ جمعہ مندرجہ الفضل مورخہ ۶ اگست ۱۹۳۵ء)

"অনেক দিন পরে এক পাঠাগার হইতে একখানা পুস্তক পাওয়া গেল। যাহা ছাপার পরে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। এই পুস্তকের রচয়িতা জনৈক ইটালীয় ইঞ্জিনিয়ার। সে আফগানিস্তানে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। সে লিখিতেছে যে, সাহেবজাদা আবদুল লতিফ (কাদিয়ানী)-কে এই জন্য শহীদ করা হইয়াছিল- সে জেহাদের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছিল। এবং আফগান সরকারের

আশংকা হইয়াছিল যে, ইহার ফলে আফগানদের আজাদী স্পৃহা দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের উপরে ইংরেজদের প্রভুত্ব কায়েম হইবে। .....এহেন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বিবরণ দ্বারা এই ঘটনা চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, সাহেবজাদা আবদুল লতিফ সাহেব যদি চুপ করিয়া থাকিতেন এবং জেহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলিতেন তবে আর আফগান সরকার তাহাকে শহীদ করার প্রয়োজন বোধ করিত না।” —মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত জুমার খোতবা, আল–ফজল পত্রিকা, ৬ই আগষ্ট, ১৯৩৫।

"افغانستان گورنمنٹ کے وزیر داخلیہ نے مندرجہ ذیل اعلان
شائع کیا ہے۔ کابل کے دو اشخاص ملا عبدالحلیم چہار آسیانی وملا نورعلی
دکاندار قادیانی عقائد کے گرویدہ ہو چکے تھے اور لوگوں کو اس
عقیدہ کی تلقین کرکے انہیں اصلاح کی راہ سے بھٹکا رہے تھے۔
ان کے خلاف مدت سے ایک اور دعویٰ دائر ہو چکا تھا اور مملکت
افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان
کے قبضے سے پائے گئے جن سے پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے
دشمنوں کے ہاتھ بک چکے تھے" (اخبار الفضل بحوالہ امان افغان
مورخہ ۳ مارچ ۱۹۲۵ء)

“আফগান সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন যে, কাবুলের দুইজন লোক— মোল্লা আবদুল হামিদ চাহার আসিয়ানী এবং মোল্লা নূর আলী কাদিয়ানী মতবাদের ভক্ত হইয়াছিল। তাহারা সেই মতবাদের প্রচার করিয়া জনসাধারণকে সঠিক পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতেছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ দাখিল করা হইয়াছিল। এবং আফগান সরকারের স্বার্থবিরোধী বৈদেশিক ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি পত্রাদি তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাহারা আফগান সরকারের দুশমনের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিল।” —আল ফজল পত্রিকা, আমানে আফগান সূত্রে প্রাপ্ত, ৩রা মার্চ, ১৯২৫।

"روسیہ (یعنی روس) میں اگرچہ تبلیغ احمدیت کے لیے گیا
تھا لیکن چونکہ سلسلہ احمدیہ اور برٹش حکومت کے باہمی مفاد ایک
دوسرے سے وابستہ ہیں اس لیے جہاں میں اپنے سلسلے کی تبلیغ کرتا
تھا وہاں لازماً مجھے گورنمنٹ انگریزی کی خدمت گزاری بھی کرنی
پڑتی تھی۔" (بیان محمد امین صاحب قادیانی مبلغ۔ مندرجہ اخبار
الفضل مورخہ ۲۸ ستمبر ۱۹۲۲ء)

"রুশিয়া অর্থাৎ রুশ দেশে আহমদি মতবাদ প্রচারের জন্য যদিও গিয়াছিলাম; কিন্তু আহমদিয়া আন্দোলন এবং বৃটিশ সরকারের স্বার্থ পরস্পর সংযুক্ত। এই কারণে যেখানেই আমি আমার আন্দোলনের প্রচার করি, সেখানে আমাকে বাধ্য হইয়া ইংরেজ সরকারের সেবাও করিতে হইত।" —আল ফজল পত্রিকার ২৮ শে ডিসেম্বর ১৯২২ সংখ্যায় প্রকাশিত মোহাম্মদ আমীন সাহেব কাদিয়ানী মোবাল্লেগের বিবৃতি।

"دنیا ہمیں انگریزوں کا ایجنٹ سمجھتی ہے، چنانچہ جب جرمنی
میں احمدیہ عمارت کے افتتاح کی تقریب میں ایک جرمن وزیر نے
شمولیت کی تو حکومت نے اس سے جواب طلب کیا کہ کیوں تم ایسی
جماعت کی کسی تقریب میں شامل ہوتے جو انگریزوں کی ایجنٹ
ہے۔" (خلیفہ قادیان کا خطبہ جمعہ۔ مندرجہ اخبار الفضل مورخہ یکم
نومبر ۱۹۳۴ء)

"দুনিয়া আমাগিদগকে ইংরেজদের এজেন্ট বলিয়া মনে করে। সুতরাং যখন জার্মানীতে আহমদিয়া ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবে জনৈক জার্মান মন্ত্রী অংশ গ্রহণ করিল, তখন সরকার তাহার নিকট এই বলিয়া কৈফিয়ত তলব করিয়াছিল যে, কেন তুমি এমন দলের কোনও উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়াছ, যাহারা ইংরেজদের এজেন্ট।" —১৯৩৪ সালের ১লা নভেম্বর আল ফজল পত্রিকায় প্রাশিত কাদিয়ানী খলিফার জুময়ার খুতবা।

"ہمیں امید ہے کہ برٹش حکومت کی توسیع کے ساتھ ہمارے
لیے اشاعتِ اسلام کا میدان بھی وسیع ہو جائے گا اور غیر مسلم کو مسلم
بنانے کے ساتھ ہم مسلمان کو پھر مسلمان کریں گے۔" (لارڈ ہارڈنگ کی
سیاحتِ عراق پر اظہارِ خیال۔ مندرجہ الفضل مورخہ ۱۱ فروری ۱۹۱۰ء)

"আমরা আশা করি, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সাথে সাথে আমাদের ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তার লাভ করিবে এবং অ-মুসলমানদিগকে মুসলমান বানাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মুসলমানদিগকে পুনরায় মুসলমান করিব।" —লর্ড হার্ডিং-এর ইরাক ভ্রমণ সম্পর্কে মন্তব্য, আল ফজল, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১০।

"فی الواقع گورنمنٹ برطانیہ ایک ڈھال ہے جس کے نیچے
احمدی جماعت آگے ہی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس ڈھال کو ذرا
ایک طرف کر دو اور دیکھو کہ زہریلے تیروں کی کیسی خطرناک بارش
تمہارے سروں پر ہوتی ہے۔ پس کیوں ہم اس گورنمنٹ کے
شکرگزار نہ ہوں۔ ہمارے فوائد اس گورنمنٹ سے متحد ہو گئے ہیں
اور اس گورنمنٹ کی تباہی ہماری تباہی ہے اور اس گورنمنٹ کی
ترقی ہماری ترقی۔ جہاں جہاں اس گورنمنٹ کی حکومت پھیلتی جاتی
ہے، ہمارے لیے تبلیغ کا ایک میدان نکلتا آتا ہے۔"
(الفضل ۱۹ اکتوبر ۱۹۱۵ء)

"প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ সরকার একটি ঢাল স্বরূপ। উহার আশ্রয়ে থাকিয়া আহমদিয়া জামায়াত ক্রমশ অগ্রসর হইতে থাকে। এই ঢালখানা একবার একটু সরাইয়া দাও, তবেই দেখিবে, তোমাদের মাথার উপরে মারাত্মক বিষ মিশ্রিত ভয়ানক তীরবৃষ্টি কিরূপ আরম্ভ হয়। সুতরাং আমরা কেন এই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হইব না। বর্তমান সরকার ধ্বংসের অর্থ আমাদেরই

ধ্বংস, এই সরকারের উন্নতি আমাদেরও উন্নতি। আমাদের স্বার্থ এই সরকারের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। যেখানে যেখানে এই সরকারের প্রভাব বিস্তারিত হয়– আমাদের তাবলীগ পরিচালনার জন্য সেখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।" —আল ফজল পত্রিকা, ১৯ শে অক্টোবর, ১৯১৫।

বৃটিশ সরকারের সহিত বিশেষ সম্পর্ক

"سلسلۂ احمدیہ کا گورنمنٹ برطانیہ سے جو تعلق ہے وہ باقی
تمام جماعتوں سے نرالا ہے۔ ہمارے حالات ہی اس قسم کے ہیں کہ
گورنمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہو گئے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ
برطانیہ کی ترقی کے ساتھ ہمیں بھی آگے قدم بڑھانے کا موقع ملتا
ہے اور اس کو خدا نخواستہ اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس صدمے سے
ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔" (خلیفۂ قادیان کا اعلان مندرجہ اخبار
الفضل، ۲۷ جولائی ۱۹۱۸ء)

"আহমদিয়া আন্দোলনের সহিত বৃটিশ সরকারের যে সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা অন্যান্য জামায়াতের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের অবস্থান এমন যে, সরকার এবং আমাদের স্বার্থ এক হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ সরকারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্য অগ্রসর হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয়। খোদা না করুন —ইহার যদি কোন অনিষ্ট হয় তবে আমরাও সেই আঘাত হইতে রক্ষা পাইব না।" —আলফজল পত্রিকা, ২৭শে জুলাই, ১৯১৮, কাদিয়ানী খলিফার ঘোষণা।

কাদিয়ানী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

কাদিয়ানী আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ নকশা পাঠকগণের খেদমতে পেশ করা হইল। উক্ত আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাইঃ

১। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল হইতে —মুসলমানেরা যখন ইংরেজদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ —তখন পাঞ্জাবে এক ব্যক্তি নবুওয়তের দাবীদার

সাজিল। এই ভাবে— যে জাতিকে আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং হযরত মোহাম্মদের (সা) রিসালতের (নবুওয়ত) স্বীকৃত একজাতি, এক সম্প্রদায়, এবং একটি মাত্র সমাজে সংঘবদ্ধ করিয়াছে, তাহার অভ্যন্তরে এই লোকটি ঘোষণা করিল যে, "মুসলমান হওয়ার জন্য কেবল মাত্র তাওহীদ এবং রসূল হিসাবে হযরত মোহাম্মদের (সা) প্রতি ঈমান আনা বা আস্থা জ্ঞাপন করাই যথেষ্ট নহে। বরং সঙ্গে সঙ্গে আমার নবুওয়তের প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। যে ব্যক্তি আমার নবুওয়তের প্রতি ঈমান আনিবে না, তাওহীদ এবং রিসালতে মোহাম্মদীর (সা) প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও সে ব্যক্তি কাফের এবং ইসলাম হইতে খারিজ বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

২। উপরোক্ত দাবীর ভিত্তিতেই সেই লোকটি মুসলমান সমাজে কুফরী এবং ঈমানের নূতন সীমারেখার সৃষ্টি করিল এবং যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনিল তাহাদিগকে স্বতন্ত্র একটি উম্মত এবং সমাজ হিসাবে সংঘবদ্ধ করিতে লাগিল। এই নূতন উম্মত এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস, মতবাদ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই কার্যত হিন্দু ও খৃষ্টানদের সহিত মুসলমানদের যে ব্যবধান রহিয়াছে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আকীদা-বিশ্বাস, এবাদত, আত্মীয়তা এবং সখ-দুখ মোটকথা কোন ব্যাপারেই মুসলমানদের সহিত তাহাদের ঐকমত্য হইল না।

৩। ধর্মপ্রবর্তক নিজেই এই কথা প্রথম দিন হইতেই ভালভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মুসলমান সমাজ এই বিভেদ-বিশৃঙ্খলা আদৌ সহ্য করিবে না এবং তাহা করিতেও পারে না! এই কারণেই তিনি স্বয়ং এবং তাহার অনুচরগণ শুধু একটি নীতি হিসাবেই ইংরেজ সরকারের পূর্ণ আনুগত্য এবং সেবা সাহায্যের পথ গ্রহণ করে নাই। বরং নিজেদের অনুসৃত কর্মনীতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই তাহারা এই কথা স্পষ্টভাবেই বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের স্বার্থ কাফেরদের প্রাধান্যলাভের উপরেই নির্ভরশীল। সুতরাং শুধু ভারতবর্ষেই নহে বরং সমগ্র বিশ্বে ইংরেজদের প্রভুত্ব কায়েম হউক —এই ছিল তাহাদের একান্ত কাম্য। কার্যত তাহারা এরূপ চেষ্টাও করিয়াছে— যাহাতে স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্রগুলি ইংরেজদের পদানত হয়— যেন তাহাদের নূতন ধর্ম প্রচারের পথ নিষ্কন্টক হয়।

৪। মুসলমানদের পক্ষ হইতে অর্ধশতাব্দী যাবত এই জামায়াতকে আলাদা করার জন্য যতবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা বিদেশী শক্তির সহিত যোগসাজস করিয়া প্রত্যেক বারেই তাহারা বানচাল করিতে সক্ষম হইয়াছে। এবং ইংরেজ সরকারও সকল সময় দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছে যে, এই সম্প্রদায়টি যদিও সকল ব্যাপারেই মুসলমানদের সহিত সম্পর্কহীন, তথাপি তাহারা মুসলমানদের সমাজভুক্তই থাকিবে। এই ব্যবস্থার ফলে মুসলমানদের দ্বিগুণ ক্ষতি এবং কাদিয়ানীদের দ্বিগুণ লাভ হইয়াছে।

(ক) ওলামাদের পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা তদবিরের পরেও সাধারণ মুসলমানগণকে এই কথা সত্য বলিয়া বুঝাইবার অক্লান্ত চেষ্টা চলিতেছে যে, কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামেরই একটি অঙ্গ। এইভাবে মুসলমান সমাজে কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার এবং প্রসার অনেক সহজ হইয়াছে। কারণ, এমত অবস্থায় একজন সাধারণ মুসলমান কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণের সময়ে আদৌ এই কথা উপলব্ধি করে না; তাহার মনে মোটেই এই আশংকা দেখা দেয় না যে, সে ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া অন্য একটি সমাজ ব্যবস্থায় দাখিল হইতেছে। ইহার ফলে কাদিয়ানীদের লাভ হয় এই যে, তাহারা বরাবর মুসলমান সমাজ হইতে লোক ভাগাইয়া নিয়া নিজেদের দল ভারী করার সুযোগ পায় এবং ইহা দ্বারা মুসলমানদের এই ক্ষতি হয় যে, সমাজের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিরোধী একটি সমাজ ক্যান্সারের ন্যায় সমাজ দেহের মর্মমূলে বিষ ছড়াইতেছে। ফলে, হাজার হাজার মুসলমান পরিবারে বিরোধ এবং চরম বিশৃংখলা দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশ ইহার ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কারণ, এই ব্যাধির সূত্রপাত পাঞ্জাবে হইয়াছে। সুতরাং পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে এই দলের বিরুদ্ধে সর্বাধিক বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

(খ) ইংরেজ সরকারের করুণা–দৃষ্টি লাভের পর তাহারা সৈন্য বিভাগ, পুলিশ, আদালত এবং অন্যান্য সরকারী অফিস সমূহে নিজেদের লোকজনকে ভর্তি করাইতে লাগিল। কাদিয়ানীরা মুসলমান সাজিয়া মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট চাকুরীর কোটা হইতে বড় একটা অংশ অপহরণ করিতে লাগিল। অপরদিকে সরকারপক্ষ হইতে মুসলমান সমাজকে সান্ত্বনা দেওয়া হইল যে, এই দেখ— এত বড় বড় চাকুরী তোমাদিগকেই দেওয়া হইল। প্রকৃতপক্ষে

মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট চাকুরীর বিরাট একটি অংশ কাদিয়ানীদিগকে দেওয়া হইতেছিল। এই সুযোগে কাদিয়ানীরা মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী সাজিয়া নিজেদের মুসলমান বিরোধী সংগঠন মজবুত করিতে লাগিল। সরকারী কন্ট্রাক্ট, ব্যাবসায়-বাণিজ্য এবং জমিসংক্রান্ত ব্যাপারেও এই নীতি অনুসৃত হইল।

৫। পাকিস্তানের মুসলমান সমাজ স্বাধীন-সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের পরে বেশীদিন কাদিয়ানীদিগকে বরদাশত করিবে না এই আশংকায় তাহারা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নিজেদের ঘাটি মজবুত করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের যে সকল লোক দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে বহাল রহিয়াছে, তাহারা সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিজেদের লোকজন ভর্তি করিতেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাহারা কাদিয়ানীদিগকে যথাসাধ্য বেশী সুযোগ সুবিধা দিতেছে। যেন পাকিস্তানের মুসলমান সমাজ স্বাধীন ও সার্বভৌম হওয়ার পরেও কাদিয়ানীদের প্রতিরোধ করিতে সক্ষম না হয়। অন্য দিকে তাহারা বেলুচিস্তান দখল করিয়া পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নিজেদের একটি আলাদা সরকার গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই সমস্ত কারণেই পাকিস্তানের সকল দীনী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এক বাক্যে দাবী করা হইয়াছে যে, এই 'কাদিয়ানী বিষফোঁড়াটি'কে অবিলম্বে কাটিয়া পাকিস্তানের মুসলমান সমাজদেহকে ব্যাধিমুক্ত করা হউক এবং স্যার জাফরুল্লা খানকে মন্ত্রীপদ হইতে অপসারিত করা হউক। কারণ, তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রসমূহে এই 'কাদিয়ানীফোঁড়া' অবাধে বিষ ছড়াইতেছে। সুতরাং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ হইতে কাদিয়ানীদিগকে অপসারণ করা এবং তাহাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে সরকারী চাকুরীর হার নির্ধারণ অত্যন্ত আশু প্রয়োজন।

যুক্তি চাই

কিন্তু পাকিস্তান সরকার ইহাতে রাজী নহেন। পাকিস্তান গণপরিষদ তাহাতে অসম্মত। আরও আশ্চর্যের বিষয় দেশের শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশই এই ভ্রান্তধারণা পোষণ করিতেছেন যে, ইহা মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক বিরোধের পরিণাম মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত প্রস্তাবের যারা বিরোধিতা করিতেছেন তাহাদের কাছে নিজেদের সমর্থনে এবং দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করার মত কোন চূড়ান্ত এবং গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত আছে কি?

আমাদের যুক্তি প্রমাণ দেশবাসীর খেদমতে পেশ করিলাম। তাহাদেরও নিকট ইহার যুক্তি সম্মত জওয়াব থাকিলে তাহা অবশ্যই দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। নতুবা আদৌ কোন প্রমাণ না দেখাইয়া কোন ব্যাপারে গোঁড়ামী, একগুয়েমী করা বড়ই বিচিত্র বোধ হইতেছে। কারণ এক সময়ে যাহারা মোল্লাদের বিরুদ্ধে জোর গলায় যে অভিযোগ করিতেন এখন সেই অপরাধ এমন সব লোক করিতেছেন যাহারা মোল্লা না হওয়ার কারণে বড়ই গর্ভ বোধ করিতেন। অবশ্য একটি কথা তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জনমত এবং যুক্তি প্রমাণের সম্মিলিত শক্তি একদিন তাহাদিগকে অবশ্যই অবনত করিবে।

খতমে নবুয়াতের বিরুদ্ধে কাদিয়ানীদের আর একটি যুক্তির খণ্ডন

প্রশ্নঃ তাফহীমুল কুরআনে সূরা আলে ইমরানে وَاَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ ...... الخ– আয়াতের ব্যাখ্যায় ৬৯নম্বর টীকায় আপনি লিখেছেন, "এখানে এতটুকু কথা আরো বুঝে নিতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর পূর্বে প্রত্যেক নবীর কাছ থেকেই এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে আর এরই ভিত্তিতে প্রত্যেক নবীই তাঁর পরবর্তী নবী সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে অবহিত করেছেন এবং তাঁকে সমর্থন করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সা)–এর কাছ থেকেও এ ধরনের কোনো অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিলো অথবা তিনি নিজের উম্মতকে পরবর্তীকালে আগমনকারী কোনো নবীর খবর দিয়ে তার ওপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কুরআন ও হাদীসের কোথাও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।"

এ বাক্যগুলো পড়ার পর মনের মধ্যে এ কথার উদয় হলো যে, নবী মুহাম্মদ (সা) এ কথা বলেননি ঠিক কিন্তু কুরআন মজীদের সূরা আহযাবে একটি অঙ্গীকারের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে,

وَاِذْ اَخَذْ نَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ ..... الخ

এখানে মিনকা (তোমার নিকট থেকে) শব্দটির মাধ্যমে নবী করীম (সা)–কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এখানে যে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে তা সূরা আলে ইমরানে উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আলে ইমরান ও সূরা আহযাব এ উভয় সূরায় উল্লিখিত আয়াতগুলোয় অঙ্গীকারের উল্লেখ থেকে বুঝা যায় অন্য নবীদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল নবী মুহাম্মদ (সা)–এর থেকেও সেই একই অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে।

আসলে আহমদীয়াদের একটি বই পড়ার পর আমার মনে এ প্রশ্ন জেগেছে। সেখানে ঐ সূরা দুটোর উল্লিখিত আয়াতগুলোকে একটির সাহায্যে অপরটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ সঙ্গে "মিনকা" শব্দটির ওপর বিরাট আলোচনা করা হয়েছে।

উত্তরঃ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ ... الخ

সূরা আহযাবের এ আয়াতটি থেকে কাদিয়ানী সাহেবান যে যুক্তি পেশ করেন, তা যদি তারা আন্তরিকতার সাথে পেশ করে থাকেন, তাহলে তা তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। আর যদি ইচ্ছা করে লোকদের ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে করে থাকেন তাহলে তাদের গোমরাহী সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তারা সূরা আলে ইমরানের وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ আয়াতটি থেকে একটি বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। তাতে নবীগণ ও তাদের উম্মতদের কাছ থেকে আগামীতে আগমনকারী কোনো নবীর আনুগত্য করার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। আবার দ্বিতীয় একটি বক্তব্য নিয়েছেন সূরা আহযাবের উপরোল্লিখিত আয়াতটি থেকে। এখানে অন্যান্য নবীগণের সাথে সাথে রাসূলে করীম (সা)–এর থেকেও অঙ্গীকার নেয়ার কথাও বলা হয়েছে। অতপর দুটোকে জুড়ে তারা নিজেরাই এ তৃতীয় বক্তব্যটি বানিয়ে ফেলেছেন যে, নবী করীম (সা) থেকেও আগামীতে আগমনকারী কোনো নবীর ওপর ঈমান আনার ও তাকে সাহায্য–সহযোগিতা দান করার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল। অথচ যে আয়াতে আগামীতে আগমনকারী নবীর থেকে অঙ্গীকার নেয়ার কথা বলা হয়েছে, সে আয়াতের কোথাও আল্লাহ তাআলা এ কথা বলেননি যে, এ অঙ্গীকারটি হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকেও নেয়া হয়েছে। আর যে আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে

একটি অঙ্গীকার নেয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, এ অঙ্গীকারটি ছিল আগমনকারী কোনো নবীর আনুগত্যের সাথে জড়িত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুটো পৃথক বক্তব্যকে জুড়ে তৃতীয় একটি বক্তব্য, যা কুরআনের কোথাও ছিল না, তৈরি করার যৌক্তিকতা কোথায়? এর তিনটি যুক্তি বা ভিত্তি হতে পারতো। এক, যদি এ আয়াতটি নাযিল হবার পর নবী করীম (সা) সাহাবাদেরকে একত্রিত করে ঘোষণা করতেন, "হে লোকেরা! আল্লাহ আমার কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমার পর যে নবী আসবেন আমি তার ওপর ঈমান আনবো এবং তাকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করবো। কাজেই আমার অনুগত হওয়ার কারণে তোমরাও এ অঙ্গীকার করো।" কিন্তু সমগ্র হাদীস গ্রন্থগুলোর কোথাও আমরা এ বক্তব্য সম্বলিত একটি হাদীসও দেখি না। বরং বিপরীত পক্ষে এমন অসংখ্য হাদীস দেখি, যেখান থেকে নবী করীম (সা)-এর ওপর নবুয়াতের সিলসিলা খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এ কথা কি কোনোদিন কল্পনাও করা যেতে পারে যে, নবী করীম (সা)-এর থেকে এমন ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে আর তিনি তাকে এভাবে অবহেলা করে গেছেন বরং উলটো এমন সব কথা বলেছেন যার ভিত্তিতে তাঁর উম্মতের বিরাট অংশ আল্লাহ প্রেরিত কোনো নবীর ওপর ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে?

কুরআনে যদি সকল নবী ও তাঁদের উম্মতদের থেকে একটিমাত্র অঙ্গীকার নেয়ার উল্লেখ থাকতো, তাহলে সেটি এ বক্তব্য গ্রহণের দ্বিতীয় যুক্তি বা ভিত্তি হতে পারতো। আর সে অঙ্গীকারটি হচ্ছে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর ওপর ঈমান আনা। সমগ্র কুরআনে এটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অঙ্গীকারের উল্লেখ থাকতো না। এ অবস্থায় এ যুক্তি পেশ করা যেতে পারতো যে, সূরা আহযাবের উল্লিখিত আয়াতেও এ একই অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি পেশ করারও কোনো অবকাশ এখানে নেই। কুরআনে একটি নয়, বহু অঙ্গীকারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন সূরা বাকারা ১০ রুকূ'তে বনী ইসরাঈল থেকে আল্লাহর বন্দেগী, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক রক্তপাত থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৯ রুকূ'তে সমস্ত আহলে কিতাবদের থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে, আল্লাহর যে কিতাব তোমাদের হাতে দেয়া হয়েছে তোমরা তার

শিক্ষাবলী গোপন কররে না বরং তাকে সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেবে। সূরা আরাফের ২১ রুকূ'তে বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে, আল্লাহর নামে হক ছাড়া কোনো কথা বলবে না আর আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তার শিক্ষাগুলো মনে রাখবে। সূরা মায়েদার প্রথম রুকূ'তে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীদেরকে একটি অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যা তারা আল্লাহর সাথে করেছিল। তা হচ্ছে, "তোমরা আল্লাহর সাথে শ্রবণ ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছো।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে সূরা আহযাবের সংশ্লিষ্ট আয়াতে যে অঙ্গীকারের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে অঙ্গীকারটি কি ছিল তা যখন বলা হয়নি তখন এ অঙ্গীকারের মধ্য থেকে কোনো একটি গ্রহণ না করে বিশেষ করে সূরা আলে ইমরানের ৯ রুকূ'তে উল্লিখিত অঙ্গীকারটি গ্রহণ করা হবে কেন? এ জন্যে অবশ্যি একটি ভিত্তির প্রয়োজন। আর এ ভিত্তি কোথাও নেই। এর জবাবে যদি কেউ বলে যে, উভয় ক্ষেত্রে যেহেতু নবীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের কথা রয়েছে তাই একটি আয়াতের সাহায্যে অন্যটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাহলে আমি বলবো, নবীদের উম্মতের থেকে অন্য যতগুলো অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে কোনোটাই সরাসরি নেয়া হয়নি বরং নবীদের মাধ্যমেই নেয়া হয়েছে। এছাড়াও গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়নকারী ব্যক্তিমাত্রই জানেন, প্রত্যেক নবীর থেকে আল্লাহর কিতাব মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরার ও তার বিধানসমূহের আনুগত্য করার অঙ্গীকার নেয়া হয়।

তৃতীয় যুক্তি বা ভিত্তি হতে পারতো সূরা আহযাবের পূর্বাপর আলোচনা প্রসঙ্গ। সেখানে যদি এ কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকতো যে, এখানে অঙ্গীকার বলতে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের ওপর ঈমান আনার অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে, তাহলে এ বক্তব্য গ্রহণ করা সঙ্গত হতো। কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তো সম্পূর্ণ উল্টো। পূর্বাপর আলোচনা প্রসঙ্গ বরং এ অর্থ গ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছে। সূরা আহযাব শুরু করা হয়েছে এ বাক্যটির মাধ্য-মে-

"হে নবী! আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না আর তোমার রব যে ওয়াহী পাঠান সেই অনুযায়ী কাজ করো এবং আল্লাহর ওপর আস্থা স্থাপন করো।" এরপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, জাহিলিয়াতের

যুগ থেকে পালক পুত্র নেয়ার যে পদ্ধতি চলে আসছে তা এবং তার সাথে সম্পর্কিত সব রকমের কুসংস্কার ও রীতি–রসম নির্মূল করে দাও। তারপর বলা হচ্ছে, রক্তহীন সম্পর্কের মধ্যে কেবলমাত্র একটি সম্পর্কই এমন আছে যা রক্ত সম্পর্কের চাইতেও মর্যাদাসম্পন্ন। সেটি হচ্ছে, নবী ও মু'মিনদের মধ্যকার সম্পর্ক। এ সম্পর্কের কারণে নবীর স্ত্রীগণ মু'মিনদের নিকট তাদের মায়েদের ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন এবং মায়েদের ন্যায় তাদের ওপর হারাম। এছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারে একমাত্র রক্ত সম্পর্কই আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিবাহ হারাম হওয়া ও মীরাস লাভের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃত। এ বিধান নির্দেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা হামেশা সমস্ত নবীদের থেকে এবং সেই অনুযায়ী নবী করীম (সা) থেকেও যে অঙ্গীকারটি নিয়েছেন সে কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এখন একজন সাধারণ বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই দেখতে পারেন যে, এ আলোচনা প্রসঙ্গে কোথায় পরবর্তীকালে আগমনকারী একজন নবীর ওপর ঈমান আনার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার অবকাশ ছিল? এখানে বড়জোর সেই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার অবকাশ ছিল যাতে আল্লাহর কিতাবকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরার, তার বিধানসমূহ মনে রাখার, সেগুলো কার্যকর করার এবং জনসমক্ষে তা প্রকাশ করার জন্যে সকল নবীকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এরপর একটু সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা দেখছি আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)–কে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, আপনি নিজে আপনার পালকপুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে জাহিলিয়াতের সেই ভ্রান্ত ধারণা নির্মূল করে দিন যার ভিত্তিতে লোকেরা পালকপুত্রকে নিজেদের ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় মনে করতো। কাফির ও মুনাফিকরা এর বিরুদ্ধে একের পর এক আপত্তি উত্থাপন করে অপপ্রচারে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর জবাব দেন।

একঃ প্রথমত মুহাম্মদ (সা) তোমাদের মধ্য থেকে কোনো পুরুষের পিতা নন, যার ফলে তার (সেই পুরুষের) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তাঁর ওপর হারাম হতে পারে।

দুইঃ আর যদি এ কথা বলো যে, সে তার জন্যে হালাল হয়ে থাকলেও তাকে বিয়ে করার এমন কি প্রয়োজন ছিল? তাহলে এর জবাবে বলতে হয় যে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ যে কাজটি খতম করতে চান নিজে অগ্রসর হয়ে সেটি খতম করে দেয়াই হচ্ছে তাঁর দায়িত্ব।

তিনঃ এছাড়াও এটি করা তাঁর জন্যে আরো বেশী প্রয়োজন ছিল এ জন্যে যে, তিনি নিছক রাসূল নন বরং তিনি শেষ রসূল। জাহিলিয়াতের এ রীতি-রসমগুলোর যদি তিনি বিলোপ সাধন না করে যান, তাহলে তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না যিনি এগুলোর বিলোপ সাধন করবেন।

এই শেষের বক্তব্যটি আগের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে পড়লে যে কেউ নিশ্চয়তার সাথে এ কথা বলবে যে, এই পূর্বাপর বক্তব্যের মধ্যে নবী করীম (সা)-কে যে অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তা নিসন্দেহে পরবর্তীকালে আগমনকারী কোনো নবীর ওপর ঈমান আনার অঙ্গীকার নয়।

এবার বিবেচনা করুন, আলোচ্য আয়াতটি থেকে কাদিয়ানীদের বিবৃত অর্থ গ্রহণ করার জন্যে এ তিনটি ভিত্তিই হতে পারতো। এ তিনটি ভিত্তির প্রত্যকটিই তাদের বক্তব্যের সাথে সম্পর্কহীন বরং তার বিপরীত। এছাড়া তাদের কাছে যদি চতুর্থ কোনো যুক্তি ও ভিত্তি থাকে, তাহলে তা তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। আর এ তিনটি যুক্তির জবাবও তাদের কাছ থেকে নিন। অন্যথায় ন্যায়সঙ্গতভাবে এ কথা মনে করা হবে যে, তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে অন্যথায় আল্লাহর ভয়কে মন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করে সরলপ্রাণ জনসাধারণকে গোমরাহ করার জন্যে আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করেছে। যা হোক, আমি এটা বুঝতে পারছি না যে, মীর্যা সাহেব যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে এখনো তার "সাহাবা'দের যুগ শেষ হয়নি অথচ তার সমগ্র উম্মত বর্তমানে "তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন"-এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এর পরও তাদের অবস্থা এই যে, তার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত লোকেরা প্রকাশ্যে আল্লাহর কিতাব থেকে এ ধরনের ভুল ও মিথ্যা যুক্তি পেশ করে যাচ্ছে অথচ এ মূর্খতার বিরুদ্ধে সমগ্র উম্মতের মধ্যে একটি আওয়াযও বুলন্দ হচ্ছে না।

(তরজামানুল কুরআন, রমযান-শাওয়াল ১৩৭১, হিঃ জুন-জুলাই ১৯৫২)

কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা

প্রশ্নঃ কাদিয়ানী মুবাল্লিগরা তাদের সকল শক্তি দিয়ে নবুয়াতের দরজা খোলা রয়েছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতকে তারা বিশেষভাবে দলিল হিসেবে পেশ করে এবং এগুলোকে দাবীর বুনিয়াদ স্থাপন করে।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا - النساء ٦٩

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে সেই সব লোকের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত দান করেছেন। তারা হচ্ছেন, নবী, সিদ্দীক শহীদ ও সৎলোকগণ। এরা যাদের সঙ্গী–সাথী হবেন, তাদের পক্ষে এরা কতই না উত্তম সাথী।" (সূরা নিসা, আয়াত–৬৯)

তারা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলে, এখানে ধারাবাহিকভাবে চারটি জিনিসের উল্লেখ হয়েছে, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সৎ লোকগণ। তাদের জানা মতে মুহাম্মদ (সা)–এর উম্মতের লোকেরা এর মধ্য থেকে তিনটি মর্যাদা লাভ করেছে। একটি মর্যাদা লাভ করা বাকী রয়েছে– আর সেটি হল নবুয়াত। সেটিই লাভ করেছেন মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। তারা বলে, সঙ্গী–সাথী হওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে, মুহাম্মদ (সা)–এর উম্মত কেবল কিয়ামতের দিনই উপরোক্ত কয়েক শ্রেণীর লোকদের সঙ্গী হবে তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে কোনো সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎলোক নেই। আর যদি এরূপ না হয়ে থাকে তবে যেহেতু আয়াতে মর্যাদার চারটি স্তরের কথা উল্লেখ হয়েছে সেহেতু "আম্বীয়া" শ্রেণীকে উম্মতের মধ্যে বর্তমান থাকার ব্যাপারটিকে কোন্ দলিলের ভিত্তিতে বাদ রাখা যেতে পারে?

يٰبَنِى اٰدَمَ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِى فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - اعراف ٣٥

"হে আদম সন্তান! স্মরণ রেখো, তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে যদি এমন রসূল আসে যাঁরা তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনাবে, তখন যে কেউ নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের আচার–আচরণকে সংশোধন করে নেবে তার জন্য কোনো দুঃখ ও ভয়ের কারণ ঘটবে না।" (সূরা আরাফ, আয়াত ৩৫)

তারা এই আয়াত দ্বারা এই দলিল নিয়ে থাকে যে, এই আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর আয়াতটি মুহাম্মদ (সা)–এর উপর নাজিল হয়েছে। তাদের বক্তব্য হল নবী আগমনের অবকাশই যদি না থাকত তাহলে মুহাম্মদ (সা)–এর উপর এই আয়াত নাজিল হবে কেন? তাছাড়া এখানে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, "অবশ্যই তোমাদের নিকট আমার নবী আসবে।" সুতরাং এই আয়াত থেকে প্রমাণ হলো মুহাম্মদ (সা)–এর আনুগত্যের অধীনে নবী আসতে পারে।

আপনার কাছে দাবী হলো, আপনার পত্রিকায় যুক্তি প্রমাণসহ এই বিষয় আলোকপাত করুন। যাতে করে সকলেই এ থেকে উপকৃত হতে পারে।

উত্তরঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিধানের মাধ্যমে যখন কোনো বিষয়ের মীমাংসা করে দেন তখন সেই সুস্পষ্ট বিধানকে দূরে সরিয়ে রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে অসম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস থেকে নিজের প্রয়োজন মতো অর্থ বের করা এবং কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত আকীদা পোষণ করা আর সেই অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া চরম গোমরাহী, বরং আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম বিদ্রোহ। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর বিধানের পরিপন্থী কোনো পথ অবলম্বন করে, সে অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের বিদ্রোহ করে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁদেরই ঘোষণা ও বিধান বিকৃত করে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা কোনো ছোটখাটো বিদ্রোহ নয়। এ কাজ যারা করে তাদের সম্পর্কে আমরা কোনোক্রমেই এ কথা ভাবতে পারি না যে, তারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মেনে চলে। সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী কি না এবং তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন কি না– এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে আমরা –وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ النساء : ٤٩ এবং يٰبَنِىٓ اٰدَمَ প্রভৃতি আয়াতের দিকে মনোসংযোগ করতে পারতাম যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল বিশেষ করে ঐ প্রশ্নের জবাব কুরআন ও হাদীসের কোথাও না দিয়ে দিতেন। কিন্তু যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে 'খাতামান নাবিয়্যীন' আয়াতে এবং রসূলের পক্ষ থেকে অসংখ্য নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে আমরা বিশেষ করে এ প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন জবাব পেয়ে গেছি তখন ومن يطع الله এবং يبنى ادم প্রভৃতি আয়াতের দিকে দৃষ্টি

নিবদ্ধ করা এবং সেগুলো থেকে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান বিরোধী অর্থ গ্রহণ করা একমাত্র সেই ব্যক্তিরই কাজ হতে পারে, যার দিলে বিন্দুমাত্রও আল্লাহর ভয় নেই এবং যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাসই করে না যে, মরার পরে একদিন তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন দেশের দণ্ডবিধি আইনের একটি ধারায় একটি কাজকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এক ব্যক্তি এ অপরাধটিকে বৈধ কর্ম প্রমাণ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। এ উদ্দেশ্যে সে ঐ বিশেষ ধারাটিকে বাদ দিয়ে আইনের অন্যান্য অসম্পর্কিত ধারার মধ্যে সামান্যতম কোনো ইঙ্গিত বা ছোটখাট কোনো অস্পষ্ট বক্তব্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে। তারপর এগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে আইনের সুস্পষ্ট ধারা যে কাজটিকে অপরাধ গণ্য করেছে তাকে একটি বৈধ কর্ম প্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছে। এ ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ যদি দুনিয়ার পুলিশ কর্তৃপক্ষ ও আদালত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে আল্লাহর আদালতে তা কেমন করে গৃহীত হবার আশা করা যেতে পারে?

তারপর যে আয়াতগুলো থেকে কাদিয়ানীরা তাদের বক্তব্য প্রমাণ করতে চায় সেগুলো পড়ার পর অবাক হতে হয় তাদের প্রমাণ-কৌশল দেখে। দেখা যায় ঐ আয়াতগুলোর ঐ অর্থই নয়, যা তারা গায়ের জোরে টেনে-হেঁচড়ে করতে চায়। যেসব আয়াতের ওপর তারা কসরত চালিয়েছে সেগুলোর আসল অর্থ কি দেখা যাক।

সূরা নিসার ৬৯ নম্বর আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কেবল এতটুকু যে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যকারীরা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের (সৎ ব্যক্তিবর্গের) সহযোগী হবে। এ থেকে যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে তারা হয় নবী হয়ে যাবে, নয়তো সিদ্দীক অথবা শহীদ বা সালেহীন হবে- এ কথা কেমন করে বের হলো? তারপর সূরা হাদীদের ১৯ নম্বর আয়াতটি একবার অনুধাবন করুন। সেখানে বলা হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ -

অর্থাৎ 'আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের ওপর, তারাই হচ্ছে তাদের রবের কাছে সিদ্দীক ও শহীদ।' এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে,

ঈমান লাভ করার ফলে এক ব্যক্তি কেবলমাত্র সিদ্দীক ও শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। আর নবীদের ব্যাপারে বলা যায়, নবীদের সহযোগী হওয়াই ঈমানদারদের জন্য যথেষ্ট। কোনো কাজের পুরস্কারস্বরূপ কোনো ব্যক্তির নবী হয়ে যাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তাই সূরা নিসার আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যকারীরা নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে অবস্থান করবে। আর সূরা হাদীদের আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও রসূলের ওপর যারা ঈমান আনবে তারা নিজেরাই সিদ্দীক ও শহীদে পরিণত হবে।

আর সূরা আরাফের ৩৫ নম্বর আয়াত يٰبَنِىٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ সম্পর্কে বলা যায়, এটি একটি বর্ণনাধারার সাথে সম্পর্কিত। সূরা আরাফের ১১ থেকে ৩৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এ বর্ণনা চলেছে। এ বর্ণনার পূর্বাপর বিষয়বস্তুর মধ্যে রেখে একে বিচার করলে পরিষ্কার জানা যায়, মানব জাতির সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে বনী আদমকে এ সম্বোধন করা হয়েছিল। এ আয়াতগুলো পড়ে কেমন করে এ ধারণা লাভ করা যেতে পারে যে, এগুলোর মধ্যে নবী মুহাম্মদ (সা)–এর পর নবীদের আগমনের কথা বলা হয়েছে? এখানে তো হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে যখন বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কার করে দুনিয়ায় আনা হয় সে সময়কার কথা বলা হয়েছে। (তরজুমানুল কুরআন, মে, ১৯৬২ ইং)।

খতমে নবুয়াতের বিরুদ্ধে কাদিয়ানীদের দলিল

প্রশ্নঃ কাদিয়ানীরা কুরআনের কোনো কোনো আয়াত এবং কোনো কোনো হাদীসকে খতমে নবুয়াতের দলিল হিসাবে চালাবার চেষ্টা করছে। যেমন তারা يَابَنِىٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ – সূরা আরাফের এ আয়াতটির অর্থ এভাবে করে যে, মুহাম্মদের (সা) নবুয়াত লাভ এবং কুরআন অবতীর্ণের পর এ আয়াতের সম্বোধন কেবল উম্মতে মুহম্মদীই হতে পারে। এখানে "বনী আদম" দ্বারা এ উম্মতকেই বুঝানো হয়েছে। এদেরকে সম্বোধন করেই বলা হয়েছে, যদি "কখনো তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রসূল আসেন।" এখানে কাদিয়ানীদের বক্তব্য অনুযায়ী কেবল উম্মতী নবীই নয়, বরঞ্চ উম্মতী রাসূলের আগমনই প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে সূরা আল মুমিনূনের সেই আয়াত যার সূচনা হয়েছে يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ দিয়ে। তাদের মতে এই

আয়াতটিও রসূল আগমন প্রমাণ করে। একই ভাবে তারা لَوْعَاشَ اِبْرَاهِيْمُ لَكَانَ نَبِيًّا – [যদি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) পুত্র ইবরাহীম বেঁচে থাকতেন তবে তিনি নবী হতেন] হাদীসটির দ্বারা নবী আগমনের সম্ভাবনার পক্ষে দলিল গ্রহণ করে। মেহেরবানী করে এসব দলিলের হাকীকত উন্মোচন করবেন।

জবাবঃ কাদিয়ানীদের যেসব দলিল আপনি উল্লেখ করলেন সেগুলো তাদের অন্যান্য অধিকাংশ দলিলের মতোই বিভ্রান্তিকর প্রতারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ – الاعراف: ٣٥

এই আয়াতটিকে তার পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে অর্থ বের করে থাকে তা তাকে যথাস্থানে রেখে বিচার করলে যে অর্থ বের হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে যে বক্তব্য পরম্পরায় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে তা সূরা আরাফের দ্বিতীয় রুকূ' থেকে চতুর্থ রুকূ'র মাঝামাঝি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে দ্বিতীয় রুকূ'তে আদম ও হাওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ রুকূ'তে এ কাহিনীর ফলাফলের ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। এ পূর্বাপর আলোচনা সামনে রেখে ৩৫ নম্বর আয়াতটি পড়লে পরিষ্কার জানা যায় যে, এর মাধ্যমে সম্বোধন করে যে কথা বলা হয়েছে তা সৃষ্টির সূচনা পর্বের সাথে সম্পর্কিত, কুরআন অবতরণকালের সাথে সম্পর্কিত নয়। অন্য কথায় বলা যায়, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনা পর্বেই আদম সন্তানদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে যে হেদায়াত পাঠানো হবে তার আনুগত্যের ওপর তোমাদের নাযাত নির্ভর করবে।

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত কুরআনের তিনটি স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি স্থানে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে এর অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতটি এসেছে সূরা বাকারায় (৩৮ নম্বর আয়াত), দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আ'রাফে (৩৫ নম্বর আয়াত) এবং তৃতীয় আয়াতটি সূরা ত্বাহায় (১২৩ নম্বর আয়াত)। এ তিনটি আয়াতের

বিষয়বস্তুর মধ্যে গভীর সাদৃশ্যের সাথে সাথে তাদের স্থান–কালের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

কুরআনের মুফাস্‌সিরগণ অন্যান্য আয়াতের ন্যায় সূরা আরাফের এ আয়াতটিকেও হযরত আদম ও হাওয়া (আ)–এর কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত গণ্য করেন। আল্লামা ইবনে জারীর (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবু সাইয়ার আস–সুলামীর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ "আল্লাহ তায়ালা এখানে হযরত আদম (আ) ও তাঁর পরিজনদেরকে একই সঙ্গে ও একই সময়ে সম্বোধন করেছেন।" ইমাম রাযী (র) তাঁর তাফসীরে কাবীর গ্রন্থে এ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ "যদি নবী করীম (সা)–কে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, অথচ তিনি শেষ নবী, তাহলে এর অর্থ হবে, আল্লাহ তায়ালা এখানে উম্মতদের ব্যাপারে নিজের নীতি বর্ণনা করছেন।" আল্লামা আলূসী তাঁর তাফসীরে রুহুল মাআনী গ্রন্থে বলেছেনঃ "প্রত্যেক জাতির সাথে যে ব্যাপারটি ঘটে গেছে সেটাই এখানে কাহিনী আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে নবী মুহাম্মদ (সা)–এর উম্মতকে বনী আদম অর্থে গ্রহণ করলে মারাত্মক ভুল ও সুস্পষ্ট অর্থের বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। কারণ রসূল শব্দটি একবচনে না বলে বহুবচনে 'রুসুল' ورسله বলা হয়েছে।" আল্লামা আলূসীর বক্তব্যের শেষাংশের অর্থ হচ্ছে, যদি এখানে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে সম্বোধন করা হতো, তাহলে তাদেরকে কখনো একথা বলা যেতো না যে, "তোমাদের মধ্যে কখনো রসূলগণ আসবেন।" কারণ এ উম্মতের মধ্যে একজন রসূল [মুহাম্মদ (সা)] ছাড়া অন্য কোনো রসূল আসার প্রশ্নই ওঠে না।

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ –*

এ আয়াতটিকে এর পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন না করলে, কাদিয়ানীরা এর যে অর্থ করেছে তা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। যে বক্তব্য প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে তা দ্বিতীয় রুকূ' থেকে শুরু হয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে। এসব আয়াতে হযরত নূহ (আ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ)

---

* অর্থাৎ "হে রসূলগণ! পাক–পবিত্র খাদ্য খাও এবং ভালো কাজ করো, অবশ্যি তোমরা যা কিছু করো আমি তা সব জানি।" (মুমেনুন–৫১)

পর্যন্ত সমস্ত নবী ও তাঁদের জাতির কথা আলোচনা করে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক যুগে নবীগণ মানুষদেরকে একটি শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন, তাঁদের পদ্ধতিও ছিল এক ও অভিন্ন এবং তাঁদের ওপর আল্লাহ তায়ালা একই ধরনের অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। বিপরীতপক্ষে পথভ্রষ্ট জাতিরা হামেশা আল্লাহর পথ ত্যাগ করে দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছে।" এ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ আয়াতটি কোনোক্রমেই নিম্নোক্ত অর্থে নাযিল হয়নি, "হে রসূলগণ! তোমরা যারা মুহাম্মদ (সা)–এর পরে আসবে, তোমরা পাক–পবিত্র খাদ্য খাও এবং ভালো কাজ করো।" বরং এ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, নূহ (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত যত নবী এসেছিলেন তাঁদের সবাইকে আলাহ তায়ালা এই একই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা পাক–পবিত্র খাদ্য খাও ও ভালো কাজ করো।

এ আয়াতটি থেকেও মুফাস্সিরগণ কখনো নবী মুহাম্মদ (সা)–এর পর নবুয়তের দরজা খুলে যাওয়ার অর্থ নেননি। আরো বেশী অনুসন্ধান ও মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করতে চাইলে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এ স্থানটির আলোচনা পাঠ করতে পারেন। لو عاش ابراهيم لكان نبيا অর্থাৎ ইবরাহীম [রাসূলে করীম (সা)–এর পুত্র] বেঁচে থাকলে অবশ্যি নবী হতো। –এ হাদীসটি থেকেও কাদিয়ানীগণ যে প্রমাণ উপস্থাপন করেন তা চারটি কারণে ভুল।

এক, যে রেওয়ায়েতে এটিকে নবী করীম (সা)–এর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তার সনদ দুর্বল এবং কোনো মুহাদ্দিসও এই সনদকে শক্তিশালী বলেননি।

দুই, নববী ও ইবনে আবদুল বারের ন্যায় শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের বিষয়বস্তুকে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন। ইমাম নববী তাঁর "তাহযীবুল আস্মা ওয়াল্ লুগাত" গ্রন্থে লিখেছেনঃ

اما ماروى من بعض المتقدمين لوعاش ابراهيم لكان نبيا
نَبَاطل وجسارة على الكلام على المغيبات ومما زفة وهجوم
على عظيم –

অর্থাৎ "আর কোনো কোনো পূর্ববর্তী আলেম যে কথা লিখে গেছেন যে, যদি ইবরাহীম [মুহাম্মদ (সা)–এর পুত্র] জীবিত থাকতো, তাহলে সে নবী হতো– এ কথাটি সত্য নয়। কারণ এটি গায়েব সম্পর্কে কথা বলার দুঃসাহস এবং মুখ থেকে না ভেবে–চিন্তে একটি কথা বলে ফেলার মতো।"

আল্লামা ইবনে আবদুল বার 'তামহীদ' গ্রন্থে লিখেছেনঃ

لادری ماھذ افقد ولدنوح علیه السلام غیرنبی ولولم یلدالنبی الانبیاء لکان کل احدنبیا لانهم من نوح علیه السلام –

অর্থাৎ "আমি জানি না এটি কেমন বিষয়বস্তু। নূহ (আ)–এর পরিবারে এমন সন্তান জন্ম নিয়েছে, যে নবী ছিল না। অথচ যদি নবীর পুত্রের জন্যে নবী হওয়া অপরিহার্য হতো, তাহলে আজ দুনিয়াতে সবাই নবী হতো। কারণ সবাই নূহ (আ)–এর আওলাদ।"

তিন, অধিকাংশ রেওয়ায়েতে এ হাদীসকে নবী (সা)–এর উক্তির পরিবর্তে সাহাবাগণের উক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আবার তাঁরা এই সঙ্গে এ কথাও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যেহেতু নবী (সা)–এর পর আর কোনো নবী নেই তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর পুত্রকে উঠিয়ে নিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বোখারীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছেঃ

عن اسمعیل بن ابی خَالد قال قلت لعبد اللّٰه بن ابی اوفی ارأیت ابراهیم ابن النبی صلی اللّٰه علیه وسلم قال مات صغیر اولو قضی ان یکون بعد محمد صلی الله علیه وسلم نبی عاش ابنه ولکن لانبی بعده– (بخاری کتاب الادب باب من سمی باسماء الانبیاء)

"ইসমাইল ইবনে আবী খালেদ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা)–কে (সাহাবা) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (সা)–এর পুত্র ইবরাহীমকে দেখেছিলেন? তিনি বলেন, সে শৈশবেই মারা যায়। যদি আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মদ (সা)–এর পর কোনো নবী পাঠাবার ফয়সালা করতেন

তাহলে তাঁর পুত্রকে জীবিত রাখতেন। কিন্তু রসূলে করীম (সা)–এর পর আর কোনো নবী নেই।"

হযরত আনাস (রা) প্রায় এরই সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

ولو بقى لكان نبيالكن لم يبق لان نبيكم اخرالانبياء–

"যদি সে জীবিত থাকতো তাহলে নবী হতো। কিন্তু সে জীবিত থাকেনি। কারণ তোমাদের নবী হচ্ছেন শেষ নবী।" (তাফসীরে রুহুল মাআনী ঃ ২২ খণ্ড, ৩ পৃঃ)

চার, যে রেওয়ায়েতে এ উক্তিটিকে নবী করীম (সা)–এর উক্তি বলা হয়েছে এবং যাকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য গণ্য করা হয়েছে যদি তাতে সাহাবায়ে কেরামের এ ব্যাখ্যা না থাকতো এবং মুহাদ্দিসগণের এ উক্তিগুলো সেখানে সংযুক্ত নাও হতো তবুও তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতো না। কারণ হাদীস শাস্ত্রের সর্বসম্মত নীতি হচ্ছে, কোনো একটি রেওয়ায়েতের বিষয়বস্তু যদি বহু সংখ্যক নির্ভুল হাদীসের সাথে সংঘর্ষশীল হয়, তাহলে তাকে কোনোক্রমেই গ্রহণ করা যেতে পারে না। তাহলে এখন দেখা যাক, একদিকে অসংখ্য নির্ভুল ও শক্তিশালী সনদ সম্বলিত হাদীস, যাতে পরিষ্কারভাবে এ কথা বলে দেয়া হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ (সা)–এর পর নবুয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে আর অন্যদিকে এই একটি মাত্র রেওয়ায়াত, যা নবুয়াতের দরজা খোলা থাকার সম্ভাবনা প্রকাশ করে– এই দু'টি অবস্থা পর্যালোচনা করলে এই একটিমাত্র রেওয়ায়াতের মোকাবিলায় অসংখ্য রেওয়ায়াতকে কেমন করে প্রত্যাখ্যান করা যায়? (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর, ১৯৫৪ ইং)

খতমে নবুয়াত প্রসঙ্গ

প্রশ্নঃ এতে সন্দেহ নেই, মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদা হচ্ছে মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে নতুন কোনো নবী আসবে না। তা সত্ত্বেও মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে এবং কাদিয়ানী জামাতের কোনো কোনো বক্তব্য আমার কাছে ভাল মনে হয়।

যেমন, মির্জা সাহেবের মুখমণ্ডল আমার দৃষ্টিতে নিষ্পাপ এবং শিশুদের মতো দেখায়। একজন মিথ্যা প্রতারক ব্যক্তির মুখমণ্ডল কি এমনটি হতে পারে? আসমানী বিয়ে ব্যতীত তার প্রায় সকল ভবিষ্যত বাণীই বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। তাঁর দলও দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং তাদের মধ্যে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিরাট জজবা এবং ত্যাগ ও কুরবানী পরিলক্ষিত হয়।

এসব জিনিস আমাকে ভাবনায় ফেলেছে। আমি চাই আমার হৃদয় মনকে আশ্বস্ত করার জন্য এ বিষয়ে আপনি আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলুন, যাতে করে আমার ভাবনা ও পেরেশানি দূর হয় এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য উন্মোচিত হয়ে যায়।

জবাবঃ মির্জা গোলাম আহমদের ব্যাপারে যে কারণগুলো আপনাকে ভাবিয়ে তুলেছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর মৌলিক কোনো গুরুত্ব নেই। আর একজন নবী হবার দাবীদারের দাবীকেও এসব জিনিসের ভিত্তিতে কখনো যাচাই-বাছাই করা যেতে পারে না। কিন্তু তার দাবীকে চিন্তাযোগ্য মনে করার জন্যে এর চাইতে মজবুত কারণ বর্তমান থাকলেও তা ভ্রুক্ষেপযোগ্য ছিল না। এর কারণ হলো, কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ উভয়ের দৃষ্টিতে নবুয়ত দীনের একটি মৌলিক বিষয়। অর্থাৎ মানুষের ঈমান ও কুফরীর ভিত্তি এরই ওপর স্থাপিত এবং এরই ভিত্তিতে তার আখেরাতে সাফল্য ও ব্যর্থতার ফায়সালা হবে। কোনো সাচ্চা নবীকে না মানলে মানুষ কাফের হয়ে যাবে। আবার মিথ্যা নবীকে মেনে নিলেও কাফের হয়ে যাবে। এই ধরনের মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী কোনো বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) কখনো অস্পষ্ট, জটিল ও সন্দেহযুক্ত করে রাখেননি। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূল (সা) সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন পদ্ধতিতে পথ দেখিয়েছেন। মানুষের দীন ও ঈমান যাতে বিপদগ্রস্ত না হয় এবং তার গোমরাহীর জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা) দায়ী না হন এর ব্যবস্থা তাঁরা আগেই করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগে কখনো কোনো নবীর যুগে এ কথা বলা হয়নি যে, নবুয়াতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেছে এবং আর কোনো নবী আসবেন না। এর অর্থ হচ্ছে, নবীদের আসার দরজা তখন খোলা ছিল এবং তখন আর কোনো নবী আসবেন না এ কথা বলে

কোনো ব্যক্তি কোনো নবুয়াতের দাবীদারের দাবী অস্বীকার করার অধিকার রাখতো না। আবার সে যুগে নবীগণ তাঁদের পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকতেন। তাঁরা নিজেদের অনুসারীদের নিকট থেকে পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীদের আনুগত্য করার শপথ নিতেন। এসব কার্যক্রমও কথাটিকে আরো শক্তিশালী করতো যে, কোনো ব্যক্তি নিজেকে নবী হিসেবে পেশ করলে কোনো প্রকার ভাবনা-চিন্তা না করে এক কথায় তাকে নাকচ করা চলতো না। বরং তার দাওয়াত, ব্যক্তিত্ব, কার্যাবলী ও অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি যথার্থ আল্লাহর নবী না মিথ্যা নবুয়াতের দাবীদার তা জানার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পর এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। এখন ব্যাপারটি শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর পরে আর কোনো নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেননি এবং উম্মতের নিকট থেকে তার প্রতি আনুগত্যের শপথও নেননি, বরং বিপরীত পক্ষে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী এবং তিনি একটা দু'টা নয়, অসংখ্য নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর পরে নবুয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আর কোনো নবী আসবেন না। এখন যে নবুয়াতের দাবী নিয়ে দাঁড়াবে সে হবে দাজ্জাল। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর নবীর দৃষ্টিতে কি বর্তমানে মানুষের ইসলাম ও কুফরীর ব্যাপারটি নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ নয়? রসূলুল্লাহ (সা)-এর পরবর্তী মুমিনগণই কি শুধুমাত্র কুফরীর ফিতনা থেকে বাঁচার অধিকারী ছিল? এ জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণ কি শুধু তাদেরকেই নবুয়াতের দরজা খোলা থাকার এবং নবীদের আগমনের সিলসিলা জারি থাকার কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাবার ব্যবস্থা করেছিলেন? কিন্তু এখন তাঁরা জেনে-বুঝেই কি আমাদেরকে এ বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন? অর্থাৎ একদিকে থাকছে নবী আসার সম্ভাবনা, যাকে মানা না মানার কারণে আমরা ঈমানদার বা কাফের হয়ে যেতে পারি। আবার অন্যদিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল কেবল নবীর আগমনের খবর থেকে আমাদেরকে অনবহিত রেখেই ক্ষান্ত হননি, বরং এর থেকেও এগিয়ে এসে তাঁরা অনবরত এমন সব কথা বলে যাচ্ছেন যার ফলে আমরা মনে করছি নবুয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এবং এজন্যে নবুয়াতের

দাবীদারকে মেনে নিতে পারছি ন। আপনাদের বিবেক–বুদ্ধি সত্যিই কি এ কথা বলে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা) আমাদের সাথে এ ধরনের প্রতারণা করতে পারেন?

কাদিয়ানীরা 'খাতামান নাবিয়্যীন' শব্দের ব্যাখ্য যা খুশী করতে পারে। কিন্তু কমপক্ষে এতটুকু কথা তো তারা অস্বীকার করতে পারবে না যে, নবুয়াতের সিলসিলা খতম করাও এর অর্থ হতে পারে এবং উম্মতের ওলামা ও জনগণের কোটির মধ্যে নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয় শ' নিরানব্বই জন এ শব্দের এই অর্থই করে। প্রশ্ন হচ্ছে, নবুয়াতের মতো এমন একটি নাজুক বিষয়ে, যার ওপর মুসলমানদের ঈমান ও কুফরী নির্ভর করে, আল্লাহর কি এমন একটি ভাষা ব্যবহার করা উচিত ছিল, যা থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কাদিয়ানী ছাড়া সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদী এই মনে করেছে যে, এখন আর কোনো নবী আসবেন না? আর নবী মুহাম্মদ (সা)–এর উক্তিগুলো তো এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ভিন্নতর ব্যাখ্যার অবকাশই রাখে না। এ উক্তিগুলোতে দ্ব্যর্থহীনভাবে এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর নবীর কি আমাদের সাথে এমন কোনো শত্রুতা ছিল যার জন্যে তাঁর পরে নবী আসবেন অথচ তিনি উল্টো আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে গেলেন যাতে করে আমরা তাকে না মানি এবং কাফের হয়ে জাহান্নামে চলে যাই?

এ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যতই আকর্ষণীয় চেহারা–সুরাতের অধিকারী হোক না কেন, তার ভবিষ্যদ্বাণী শতকরা একশো ভাগ সত্য প্রমাণিত হলেও এবং তার হাজারো কৃতিত্ব সত্ত্বেও আমরা তার নবুয়াতের দাবীকে বিবেচনাযোগ্যই মনে করি না। কারণ নবী আসার সম্ভাবনা থাকলে তবেই তো এটা বিবেচনাযোগ্য হতো। আমরা তো প্রত্যেক নবুয়াতের দাবীদারের কথা শুনামাত্রই পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে তাকে মিথ্যুক অভিহিত করবো এবং নবুয়াতের সপক্ষে আনা তার যুক্তি–প্রমাণের ওপর কোনোই গুরুত্বারোপ করবো না। এটা যদি কুফরী হয়ে থাকে তাহলে এর কোনো দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তাবে না। কারণ কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সাফাই পেশ করার

জন্যে আমাদের কাছে কুরআন ও রসূলের হাদীস রয়ে গেছে।[১] (তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর, ১৯৫৯ ইং)।

১. উদাহরণস্বরূপ নবী পাকের সেই বাণীটি দেখুন, যাতে তিনি নবুয়াতের ধারাবাহিকতাকে একটা অট্টালিকার সাথে তুলনা করেছেন। প্রত্যেক নবীকে সেই অট্টালিকার একটি ইট বলে আখ্যায়িত করেছেন। অবশেষে বলেছেন, অট্টালিকায় এখন একটিমাত্র ইট স্থাপনের জায়গা বাকী ছিলো আর "সেই সর্বশেষ ইটটি হলাম আমি।"